সোনার বাঙ্‌লা

প্রথম খণ্ড

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ.
শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়

এ. মুখার্জ্জী এণ্ড ব্রাদার্স
— প্রকাশক ও পুস্তক-বিক্রেতা —
৬, কলেজ স্কোয়ার : কলিকাতা

সাহিত্য-সম্রাট্ বঙ্কিমচন্দ্র বড় দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন, "বাঙ্লার ইতিহাস নাই; গ্রীন্ল্যাণ্ডের ইতিহাস লিখিত হইয়াছে, মাওরি জাতির ইতিহাসও আছে, কিন্তু যে দেশে গৌড়-তাম্রলিপ্তি-সপ্তগ্রামাদি নগর ছিল, যেখানে নৈষধ-চরিত ও গীতগোবিন্দ লিখিত হইয়াছে, যে দেশ উদয়নাচার্য্য, রঘুনাথ শিরোমণি ও চৈতন্যদেবের জন্মভূমি, সে দেশের ইতিহাস নাই।...বাঙ্লার ইতিহাস চাই, নহিলে বাঙালী কখনও মানুষ হইবে না।" বঙ্কিমের এ আক্ষেপ অক্ষরে অক্ষরে সত্য। বাঙালীর উজ্জ্বল অতীতের প্রতি আমরা উদাসীন, তাই আমরা দুর্ব্বল ও গৌরবশূন্য জাতি হইয়া পড়িয়াছি। আমরা ইংলণ্ড, ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর ভূগোল ও ইতিহাস কণ্ঠস্থ করি, কিন্তু এই সুজলা সুফলা বঙ্গভূমির উজ্জ্বল অতীত ইতি-হাসের কোনও সংবাদই আমরা রাখি না।

অল্প বয়স হইতে সোনার বাঙ্লার ছেলেরা যাহাতে তাহাদের স্বদেশের শহরগুলির

ঐতিহাসিক তথ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করে সেই উদ্দেশ্যে "সোনার বাঙ্‌লা" সিরিজ প্রকাশিত হইতেছে। প্রথম খণ্ডে বাঙ্‌লার চারিটি শহরের—কলিকাতা, মুর্শিদাবাদ,ঢাকা ও দার্জ্জিলিঙ্‌—বর্ণনা রহিল। পরবর্ত্তী খণ্ডসমূহে বাঙ্‌লার জেলা ও বিভাগ-সমূহের বর্ণনা থাকিবে। পুস্তকখানিতে অতি সরল ভাষায় বাঙ্‌লাদেশের ঐতিহাসিক তথ্য ও অন্যান্য জ্ঞাতব্য বিষয়ের আলোচনা করা হইয়াছে। বালকবালিকারা ইহা পাঠ করিয়া তৃপ্তি লাভ করিলে আমরা আমাদের সকল শ্রম সার্থক জ্ঞান করিব।

পরিশেষে বক্তব্য এই যে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অনিলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এম্‌. এ. মহাশয় অসীম যত্ন-সহকারে পুস্তকখানির পাণ্ডুলিপি দেখিয়া ইহার প্রণয়নে যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছেন। সেজন্য তাঁহাকে আমরা আমাদের আন্তরিক ধন্যবাদ জানাইতেছি।

শ্রীকনক বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীঅমিয়রঞ্জন মুখোপাধ্যায়
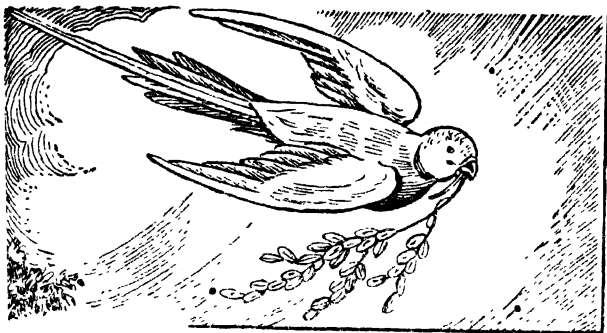
"কোন্ দেশেতে তরুলতা—
সকল দেশের চাইতে শ্যামল ?
কোন্ দেশেতে চ'ল্‌তে গেলেই—
দল্‌তে হয় রে দূর্ব্বা কোমল ?
কোথায় ফলে সোনার ফসল—
সোনার কমল ফোটে রে ?
সে আমাদের বাঙ্‌লা দেশ,
আমাদেরি বাঙ্‌লা রে !"

সূচনা

"আমার সোনার বাঙ্‌লা,
আমি তোমায় ভালবাসি—"

আমরা বাঙালী—বঙ্গদেশ আমাদের জন্মভূমি। বঙ্গদেশের সাধারণ নাম বাঙ্‌লা বা বাঙ্‌লা দেশ।

বাঙ্‌লার ফলে জলে, বাঙ্‌লার ফসলে আমরা প্রতিপালিত; বাঙ্‌লার স্নিগ্ধ বায়ুতে আমরা পরিপুষ্ট; বাঙ্‌লার চির-মধুর

সৌন্দর্য্যে আমরা মুগ্ধ। মোটকথা, শিশু যেমন মাতৃস্তন্য পান করিয়া, মাতৃবক্ষ আশ্রয় করিয়া, মায়ের কোলে-কাঁখে চড়িয়া লালিত-পালিত হয় এবং ক্রমশঃ বড় হইয়া উঠে, আমরাও ঠিক তেমনই ভাবে দিন-দিন বাঙ্‌লার বুকে পরিপুষ্ট হইয়া উঠিতেছি।

বাঙ্‌লার ফুল-ফল, বাঙ্‌লার জল-বায়ু এবং বাঙ্‌লার মাটি-আকাশ ভোগ করিয়া আমরা লালিত-পালিত হই। সুতরাং বাঙ্‌লা আমাদের কেবল জন্মভূমি নহে, বাঙ্‌লা আমাদের মাতৃভূমি।

স্তন্য-দায়িনী মাতা যেমন আমাদের বড় গৌরবের, বড় আদরের,—জন্মভূমিও সেইরূপ আমাদের বড় গৌরবের ও আদরের জিনিস। এমন যে গৌরবের ও আদরের বস্তু, তাহার অতীত বিবরণ জানিতে কে না লালায়িত হয়? বাঙ্‌লার রূপ পূর্ব্বে কি রকম ছিল, তারপর কোথায় কোন্ আঘাতের ফলে তাহার কোন্ অঙ্গ কেমন করিয়া দুমড়াইয়া বিকৃত হইয়া গেল, আর অনুকূল অবস্থায় কোন্ অঙ্গই বা সহসা পরিপুষ্ট হইয়া উঠিল, এসব জানিবার জন্য কৌতূহল দুর্দ্দমনীয় ও স্বাভাবিক।

বাঙ্‌লা দেশ—প্রাচীন ও আধুনিক

বাঙ্‌লা দেশ বলিতে এখন কতটুকু বুঝায়, পূর্ব্বেই বা কতটুকু বুঝাইত, জন্মভূমিকে জানিবার এই আকাঙ্ক্ষাও কিছুমাত্র অসঙ্গত নহে।

'বাঙ্‌লা' অতি প্রাচীন দেশ। পুরাণ, উপপুরাণ ইত্যাদি বহু প্রাচীন গ্রন্থে 'বঙ্গদেশ' বা 'বাঙ্‌লার' উল্লেখ দেখা যায়। কিন্তু বাঙ্‌লা ও বাঙালী বলিলে আমরা এখন যাহা বুঝিয়া থাকি, প্রাচীন বাঙ্‌লা ও বাঙালী ঠিক তাহা বুঝাইত না। প্রাচীন বাঙ্‌লা অনেকাংশে আধুনিক পূর্ব্ব-বাঙ্‌লা—ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীর। করতোয়া নদীর পূর্ব্বদিকে অবস্থিত ভূভাগ 'কামরূপ' নামে বিখ্যাত ছিল। তারপর সেই প্রাচীন স্থূলকায়া করতোয়া শীর্ণদেহা হইয়া গেল; তখন তাহার পূর্ব্বদিকে অবস্থিত রঙ্গপুর, জলপাইগুড়ি ও কোচবিহার জেলা বাঙ্‌লার অন্তর্গত হইল,—কামরূপের আকৃতি ছোট হইয়া গেল। বর্ত্তমান বিরাট বাঙ্‌লার অন্যান্য অংশ তখন বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল; যেমন,—রাঢ়, বরেন্দ্র ও সমতট বা বগড়ী।

ভাগীরথীর পশ্চিমে সমগ্র ভূভাগ তখন রাঢ় নামে পরিচিত ছিল। মহানন্দা নদীর পূর্ব্ব হইতে করতোয়া নদীর তীর পর্য্যন্ত সমগ্র ভূ-ভাগ বরেন্দ্র ভূমি; গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী 'ব-দ্বীপের' নাম ছিল বকদ্বীপ, বগ্‌ড়ী বা সমতট। বলা বাহুল্য, ভিন্ন ভিন্ন এই সবগুলি বিভাগই এক্ষণে সমগ্র বাঙ্‌লা দেশের অন্তর্গত।

নামের উৎপত্তি

প্রাচীন কালের সেই ক্ষুদ্র বঙ্গদেশ গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের প্লাবনে প্রতি বৎসরই ভাসিয়া যাইত। তাহাতে নিকটবর্ত্তী

জনপদসমূহ ভীষণ ভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইত। কাজেই গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্রের তাণ্ডব উচ্ছ্বাস নিবারণ করিবার জন্য 'বাঁধ' বা 'আল্' দিয়া জলপ্লাবনের গতিরোধ করিবার চেষ্টা হইল। সম্ভবতঃ এই কারণে 'বঙ্গ' ও 'আল্'—এই শব্দ দুইটি পরস্পর সংযুক্ত হইয়া পড়ে এবং তখন তাহাদের যুক্ত নাম প্রবর্ত্তিত হইল,—'বঙ্গাল'।

ভারতে মুসলমান আক্রমণের পূর্ব্বে, অতি প্রাচীন শিলা-লিপিতে 'বঙ্গাল' শব্দের ব্যবহার দেখা গিয়াছে। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে তখন হইতেই ইহা 'বাঙ্গলা' নামে সুপরিচিত ছিল। অতএব, প্রাচীন 'বঙ্গ' হইতে 'বাঙ্গলা,' বা 'বাঙ্‌লা' নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই।

কলিকাতা

সপ্তগ্রামে সূর্য্যোদয়
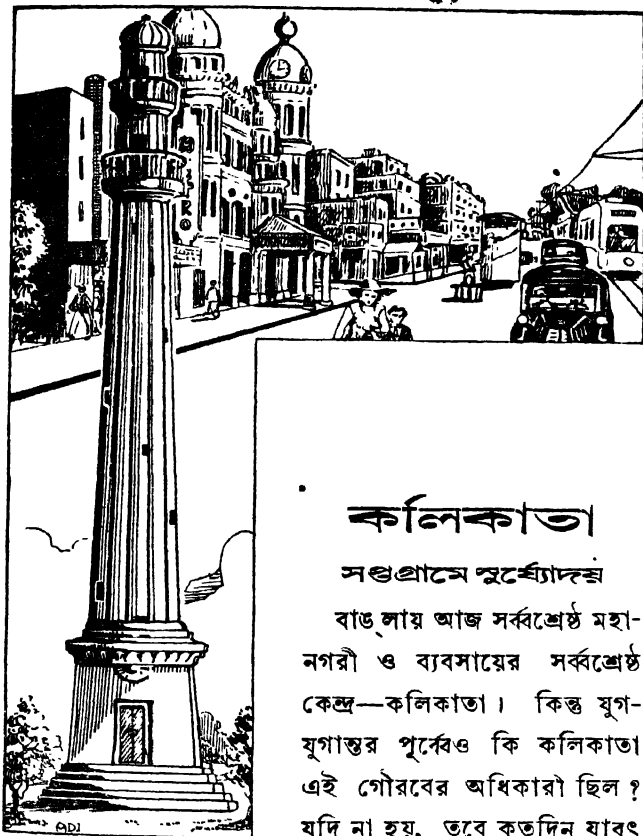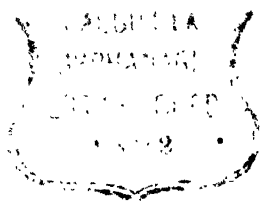
বাঙ্‌লায় আজ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মহা-নগরী ও ব্যবসায়ের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র—কলিকাতা। কিন্তু যুগ-যুগান্তর পূর্ব্বেও কি কলিকাতা এই গৌরবের অধিকারী ছিল? যদি না হয়, তবে কতদিন যাবৎ

কলিকাতার এই অতুল সমৃদ্ধি, আর এই রাজোচিত মহা-গৌরব? আর, তৎপূর্ব্বে এরূপ গৌরবের অধিকারী ছিল কোন্ স্থান?

কলিকাতার এই সমৃদ্ধি ও বাণিজ্য-প্রসার খুব বেশী দিনের নহে, ইহা অতি আধুনিক। তৎপূর্ব্বে বাঙ্‌লার ব্যবসায় প্রধানতঃ যেখানে কেন্দ্রীভূত ছিল, তাহার নাম সপ্তগ্রাম।

প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে মোগল সম্রাট্ আকবর ভারতে রাজত্ব করিতেন। সুদূর দিল্লী তখন মোগল সাম্রাজ্যের রাজধানী। বিরাট মোগল সাম্রাজ্য সুবা, সরকার, পরগণা প্রভৃতি নানাভাগে বিভক্ত ছিল। বাঙ্‌লাদেশ তখন 'সুবা-বাঙ্গলা' নামে বিখ্যাত ছিল। 'সরকার সপ্তগ্রাম' এই সুবা-বাঙ্গলার একটি বিভাগ মাত্র।

সরকার সপ্তগ্রামের অধীন 'সপ্তগ্রাম' বন্দরই প্রাচীন কালে বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিল। ব্যবসায়ীরা বর্ত্তমান গার্ডেন-রীচের বিপরীত তীরস্থ ব্যাতোড় হইয়া সপ্তগ্রামে আসিত। সপ্তগ্রামের ব্যবসায় তাহাতে জাঁকিয়া উঠিয়াছিল। কিন্তু কালক্রমে ইহার পরিবর্ত্তন হইল।

সপ্তগ্রামে সূর্য্যাস্ত

সরস্বতী নদীতে চড়া পড়িতে আরম্ভ করিল, খাল-নালা বুজিয়া আসিল; ব্যবসায়ীরা আর সহজে সপ্তগ্রামে যাওয়া-আসা করিতে পারিল না। স্ফীতকায়া সরস্বতী নদী সঙ্কীর্ণা হইয়া গেল; আর শীর্ণা ভাগীরথী নদী সরস্বতীর জলধারায় পরিপুষ্টা ও গর্ব্বস্ফীতা হইয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গে কপাল

ভাঙ্গিল সপ্তগ্রামের, আর কপাল খুলিল হুগলী, চন্দননগর, চুঁচুড়া প্রভৃতি ভাগীরথী নদী-তীরবর্ত্তী স্থানগুলির।

সপ্তগ্রামের ব্যবসায়ীরা সপ্তগ্রামের আড্ডা তুলিয়া ফেলিল, নিকটবর্ত্তী অপর কোন ব্যবসায়ের স্থান অবলম্বন করাই লাভজনক মনে করিল। কিন্তু ব্যাতোড়ের হাট ব্যতীত নিকটে আর ব্যবসায়ের স্থানই বা কোথায়? পর্ত্তুগীজ প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিকেরা তখনও তাহাদের বড় বড় জাহাজ-গুলি গার্ডেনরীচের ঘাটে বাঁধিয়া অপর তীরে ব্যাতোড়ের হাট করিতে আসিত। সপ্তগ্রামের ব্যবসায়ীরাও ব্যাতোড় অবলম্বন করিল।

তাহারা ব্যাতোড়ে ব্যবসা করিবে ইহাই স্থির করিল; কিন্তু কি জানি কেন, ব্যাতোড়ে বসবাস করা তাহাদের অভিপ্রেত হইল না। তাহারা সপ্তগ্রামের তল্পিতল্পা গুটাইয়া ভাগীরথীর পূর্ব্ব তীরে লইয়া আসিল এবং বর্ত্তমান কলিকাতার বাবুঘাট হইতে খিদিরপুর পুল পর্য্যন্ত সমগ্র স্থান দখল করিয়া বসিল।

নূতন বসতি—গোবিন্দপুর

দখল করিয়া বসিল বটে, কিন্তু এই দখল করিবার ইতিহাস অতি করুণ ও ভয়ানক! কারণ, তখন ত এই সমগ্র স্থানটি আধুনিক শোভায় সুসজ্জিত ছিল না, আর এইরূপ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নও ছিল না; সুতরাং মনে করা মাত্রই তাহারা ইহাকে বাসোপযোগী করিয়া লইতে পারে নাই।

জলাভূমি ও ভীষণ জঙ্গলে তখন সমগ্র জায়গাটি আচ্ছন্ন।

নিবিড় জঙ্গলের বহু অংশ তখন সূর্য্যেরও অনধিগম্য ছিল। তাহার উপর শৃগাল, বন্য বরাহ এবং ব্যাঘ্র পর্য্যন্ত সকলের হৃদয়ে ত্রাসের সঞ্চার করিত। সুতরাং এহেন স্থানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিতে সপ্তগ্রামের শেঠ, বসাক প্রভৃতি বণিক্‌দিগকে যে কত দুঃখ কষ্ট বরণ করিতে হইয়াছিল, তাহা আজ এত দীর্ঘকাল পরে বর্ণনা করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

যাহা হউক, তাহারা জঙ্গল কাটিল, খানা-খন্দ ভরাট করিল, কত জলাভূমির উদ্ধার করিল! তারপর সুদীর্ঘকাল অবিরত পরিশ্রম ও যত্ন করিয়া ইহাকে বাসোপযোগী করিয়া তুলিল।

(শেঠ-বসাকদের গৃহ-দেবতার নাম ছিল 'গোবিন্দ জীউ'। সেই গৃহ-দেবতার নাম অনুসারে এই নূতন গ্রামখানির নাম হইল 'গোবিন্দপুর'।)

গ্রামটির নাম-করণ সম্বন্ধে কিছু মত-বৈষম্য আছে। কেহ কেহ বলেন, হাটখোলার দত্তদের পূর্ব্বপুরুষ গোবিন্দশরণ দত্তের নাম অনুসারে ইহার নাম হয়; কেহ বলেন, গোবিন্দরাম মিত্র নামে সে সময় কলিকাতায় এক জমিদার ছিলেন। পাশ্চাত্য ব্যবসায়ীরা তাঁহার নাম দিয়াছিলেন, 'ব্ল্যাক্ জমিদার'। এই ব্ল্যাক্ জমিদারের নাম অনুসারে নাকি গ্রামের নাম হইয়াছিল 'গোবিন্দপুর'।

নাম-করণ যেভাবেই হউক, নূতন গোবিন্দপুর গড়িয়া উঠিল এবং ধনী ব্যবসায়ীদের আপ্রাণ চেষ্টায় তাহা ক্রমশঃই উন্নত হইতে লাগিল।

সূতানুটী ও কলিকাতা

বাঙ্‌লায় তখন বস্ত্র-শিল্প খুব সমৃদ্ধ। সুতরাং বস্ত্রশিল্পের প্রধান উপকরণ কার্পাস ও সূতার তখন খুব বেশী চাহিদা। পাট কেনা-বেচার জন্য এখন যেরূপ বাঙ্‌লার অনেক গ্রামে হাট বসিয়া যায়, সূতা কেনা-বেচার জন্যও তখনকার দিনে সেইরূপ হাট বসিয়া যাইত।

গোবিন্দপুরের ব্যবসায়ীরা তদানীন্তন প্রধান পণ্য সূতা ক্রয়-বিক্রয়ের নিমিত্ত গোবিন্দপুরের অনেকটা উত্তরে একটি হাট বসাইলেন। হাটে প্রচুর পরিমাণে সূতার গুলি আমদানী হইতে লাগিল,—ব্যবসায়ীরা ফাঁপিয়া উঠিলেন।

সূতার গুলিকে চল্‌তি কথায় বলা হইত 'লুটী' বা 'নুটী'। সূতার নুটী বিক্রয়ের স্থান বলিয়া এই স্থানের নাম হইল 'সূতানুটি—হাটখোলা'। এখন যেখানে বাগবাজারের খাল দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার পর হইতে বর্ত্তমান জোড়াবাগানের ঘাট পর্য্যন্ত—সমগ্র স্থানের নাম ছিল সূতানুটি। আর সূতানুটী ও গোবিন্দপুর গ্রামের মধ্যবর্ত্তী স্থানের নাম ছিল 'ডিহি-কলিকাতা'। সেই সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর, এই তিনখানি গ্রামই বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীর মূল ভিত্তি।

সোনার বাঙ্‌লার আকর্ষণ

ইংরেজগণ তাঁহাদের সুদূর স্বদেশে থাকিয়া দীর্ঘকাল যাবৎ ভারতবর্ষের সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া আসিতেছিলেন। সেই অতুল সমৃদ্ধির আকর্ষণেই তাঁহাদের এদেশে আগমন।

ভারতে পদার্পণ করিয়া তাঁহারা সর্ব্বপ্রথম মাদ্রাজে উপস্থিত হন এবং সেইখানেই তাঁহাদের বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিলেন। কিন্তু কেবল মাদ্রাজে বাণিজ্য করিয়া তাঁহারা দীর্ঘকাল সন্তুষ্ট থাকিতে পারিলেন না। বাঙ্লা দেশের উর্ব্বরতা ও অতুল সমৃদ্ধি তাঁহাদের বুকে আবার এক নূতন আশার কল্পনা জাগাইয়া দিল। তাঁহারা সোনার বাঙ্লায় বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিতে অভিলাষী হইলেন। কিন্তু তখন ইচ্ছা হইলেই যে কোন জাতি আসিয়া বাণিজ্য করিতে পারিত না, সেজন্য শাসন-কর্ত্তার অনুমতি লইতে হইত।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে (সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে) শাহ্ সুজা যখন বাঙ্লার শাসন-কর্ত্তা, সেই সময় ইংরেজ বণিক্‌গণ বাঙ্লাদেশে বাণিজ্য করিবার অনুমতি লাভ করিলেন। স্থির হইল, তাঁহারা বাঙ্লায় বাণিজ্য করিবেন আর নবাব সরকারে বার্ষিক তিন হাজার টাকা খাজনা প্রদান করিবেন। অনুমতি লাভ করিয়া তাঁহারা হুগলীতে বাণিজ্য কুঠি স্থাপন করিলেন।

ভিত্তি-প্রতিষ্ঠা—জব চার্ণক

হুগলী ও চুঁচুড়ায় পূর্ব্ব হইতেই পর্ত্তুগীজ ও ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য কুঠি ছিল। ইংরেজ বণিক্‌গণ সেখানে উপস্থিত হইলে পর্ত্তুগীজ এবং ওলন্দাজদিগের সহিত মাঝে মাঝে সংঘর্ষ হইতে লাগিল। মাঝে মাঝে নবাবের ফৌজদারের সহিতও তাঁহাদের বিবাদ হইত।

বিবাদ—ইংরেজ ও নবাব-সৈন্য

ইংরেজ বণিক্ কোম্পানীর নাম 'ইষ্ট্ ইণ্ডিয়া কোম্পানী' ছিল। কোম্পানীর প্রধান কর্ম্মকর্ত্তা তখন জব চার্ণক সাহেব। একবার ফৌজদারের সহিত বিবাদ হওয়ায় জব চার্ণক ক্রোধে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া হুগলী শহর লুণ্ঠন করিয়া লইলেন। কিন্তু পরক্ষণেই নবাবের ফৌজ আসিতেছে শুনিতে পাইয়া তিনি সুতানুটীতে পলাইয়া গেলেন।

ইহার পর পুনরায় হুগলীতে আসিলে, ফৌজদারের সহিত তাঁহার আরও কয়েকবার সংঘর্ষ হইয়াছিল। কিন্তু অসুবিধায় পড়িলেই জব চার্ণক সুতানুটীতে আশ্রয় গ্রহণ করিতেন।

এইভাবে দুইবার তিনি সুতানুটীতে আসিলেন, আবার হুগলীতে ফিরিয়া গেলেন। কিন্তু অবশেষে ১৬৯০ খৃষ্টাব্দের ২৪শে আগষ্ট তারিখে তিনি সুতানুটীতে আগমন করিলেন। তাহাই জব চার্ণকের চূড়ান্ত আগমন। ইহাকেই কলিকাতা মহানগরীর ভিত্তি প্রতিষ্ঠা বলা যাইতে পারে।

জব চার্ণক দেখিলেন, হুগলী অপেক্ষা সুতানুটী গ্রামই অধিকতর সুবিধাজনক। কারণ, নবাবের ফৌজদার সেখান হইতে অনেকটা দূরে। সুতরাং খুঁটিনাটি কারণে নবাবী ফৌজের সহিত তাঁহার বিবাদের আশঙ্কা কম। অতএব জব চার্ণক সেখানে বাণিজ্য-কুঠি স্থাপন করিলেন।

সুতানুটীতে আসিবার পর হইতে ইংরেজদিগের ব্যবসায়ের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে লাগিল, তাঁহারা স্থায়ীভাবে বসবাস

করিবার জন্ম সুতানুটী ও নিকটবর্ত্তী দুই তিনখানা গ্রাম ইজারা লইতে সচেষ্ট হইলেন।

ইংরেজগণ—জমির মালিক

ক্রমান্বয়ে কয়েকবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে ১৬৯৮ খৃষ্টাব্দে মাত্র ১৬০০০্ টাকা প্রদান করিয়া, তাঁহারা নবাব আজিম উশ্‌শানের এই অনুমতি লাভ করিলেন যে, ইংরেজগণ সুতানুটী ও তাহার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে জমি খরিদ করিতে কিংবা ইজারা লইতে পারিবেন। তারপর সেই বৎসরই অল্প কয়েকমাস পরে তাঁহারা মাত্র ১৩০০্ টাকায় সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর এই তিনখানি গ্রাম তাহাদের মালিকদিগের নিকট হইতে ক্রয় করিলেন। এই গ্রাম তিনখানির জন্ম ইংরেজদিগকে নবাব সরকারে বার্ষিক ১২৮১।।০ আনা কর দিতে হইত।

ইংরেজগণ এইরূপে ধীরে ধীরে বাঙলা দেশে 'জমির মালিক' হইয়া বসিলেন—তাঁহারা তিনখানি গ্রামের অধিপতি হইলেন। কিন্তু কাগজপত্রে তিনটি গ্রামের নাম ব্যবহার করা অসুবিধাজনক; তাঁহারা সুতানুটী ও গোবিন্দপুর গ্রাম দুটির নাম বাদ দিয়া এই সমগ্র নূতন প্রতিষ্ঠানের নামকরণ করিলেন 'কলিকাতা'।

কেবল কলিকাতার নাম ব্যবহার করিবার পক্ষে সম্ভবতঃ অন্য একটী কারণও বর্ত্তমান ছিল।

গ্রাম তিনটির মালিকানা স্বত্ব ক্রয় করিবার পূর্ব্বেই ইংরেজগণ তাঁহাদের নিরাপত্তার নিমিত্ত ভাগীরথী তীরে একটী দুর্গ

নির্ম্মাণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। বর্ত্তমান সময়ে জেনারেল পোষ্ট আফিস (বড় ডাকঘর) ও ই, আই, রেল-কোম্পানির হেড্ আফিস যেখানে অবস্থিত, ইংরেজদিগের পুরাতন দুর্গ সেই স্থানে নির্ম্মিত হইয়াছিল। যাবতীয় ইংরেজ তাঁহাদের ধন-সম্পত্তির নিরাপত্তার জন্য তখন হইতে সেই দুর্গের আশে-পাশেই বসবাস করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহার ফলে বর্ত্তমান লালদীঘি অঞ্চল শ্বেতাঙ্গদিগের প্রধান কেন্দ্র হইয়া উঠিল।

এই অংশটী সুতানুটী বা গোবিন্দপুর গ্রামের অন্তর্গত ছিল না, ইহা কলিকাতার একটী অংশ বিশেষ। সুতরাং কার্য্যতঃ কলিকাতাই ইংরেজদিগের প্রধান বাসস্থানে পরিগণিত হইল। গোবিন্দপুর ও সুতানুটীর নাম সম্ভবতঃ এই কারণেই লুপ্ত হইয়া যায়।

কলিকাতা নাম হইল কেন?

কলিকাতার নাম সম্পর্কে কয়েকটী জনশ্রুতি আছে। তন্মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নির্ভরযোগ্য বিষয়টী নিম্নে লিখিত হইল।

ইংরেজদিগের পূর্ব্বে ভারতবর্ষে পর্ত্তুগীজগণ বাণিজ্য আরম্ভ করেন। তাঁহারা ভারতীয় পণ্য দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দর হইতে বিদেশে রপ্তানি করিতেন। 'কালিকট' মার্কা দেওয়া উক্ত পণ্যদ্রব্য পাশ্চাত্য জগতে বিশেষ সমাদরের সহিত গৃহীত হইত। 'কালিকট' নামের প্রতি ক্রেতৃবর্গের এই মোহ লক্ষ্য করিয়া ইংরেজ বণিকগণ তাঁহাদের ব্যবসায়-কেন্দ্রের নাম তদনুরূপ 'কালিকোট' রাখিয়াছিলেন। ইহার অপভ্রংশ ক্রমে

ক্যালকাটা—কলিকাতা হইয়া থাকিবে। 'কালীর কোঠা' বা 'কালীর ক্ষেত্র' হইতেও 'কলিকাতা' নাম হওয়া অস্বাভাবিক নহে।

যে কোন কারণেই হউক, 'কালিকোট' বা 'কলিকাতা' নামই ইংরেজগণ মানিয়া লইয়াছিলেন, ইহার অন্য কোন পরিবর্ত্তিত নাম তাঁহারা অসুবিধাজনক মনে করিতেন।

নবাব সিরাজউদ্দৌলার সহিত ইংরেজদিগের সংঘর্ষ উপস্থিত হইলে, নবাবী ফৌজ একবার কলিকাতা জয় করিয়া লয়। সিরাজউদ্দৌলা তখন ইহার নাম রাখিয়াছিলেন 'আলিনগর'। ইংরেজেরা তাহাতে বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত বোধ করেন। পরে বাঙ্‌লা বিজয়ের জন্য মীরজাফরের সঙ্গে তাঁহাদের যে একটা গুপ্ত সন্ধি হয়, ইংরেজরা তাহাতে ইহার নাম কলিকাতাই রাখিতে হইবে, এইভাবে মীরজাফরকে চুক্তিবদ্ধ করেন। সুতরাং এই অংশের কলিকাতা নামকরণ এবং কলিকাতা নামের উপরেই প্রাধান্য স্থাপন, ইংরেজদিগের অভিপ্রায়েই যে হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

ইংরেজের রাজশক্তি

পলাশী যুদ্ধের পরে ইংরেজ বণিক্ কোম্পানী কার্য্যতঃ বাঙ্‌লার অধিপতি হইয়া বসিলেন। ব্যবসায়ীর তৌলদণ্ড সহসা তাঁহাদের হস্তে রাজদণ্ডরূপ নূতন আকার ধারণ করিল।

> "বণিকের মানদণ্ড, দেখা দিল পোহালে শর্ব্বরী
> রাজ-দণ্ডরূপে।"

ইংরেজের ভাগ্যাকাশে এই নূতন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে কলিকাতার ভাগ্যাকাশও উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। আদিম স্যাঁৎসেঁতে জলাভূমি ও বন-জঙ্গলের সমষ্টি, সাপ-বাঘের আবাস-ভূমি এবং বিবিধ ব্যাধির লীলাক্ষেত্র—সুতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর—একমাত্র কলিকাতা নামে ক্রমশঃ উন্নতির পথে অগ্রসর হইল।

পলাশীর আম্র-কুঞ্জে যে যুদ্ধের অভিনয় হইল, তাহাতে বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলা চিরদিনের জন্য ধূলায় লুণ্ঠিত হইলেন। বিজয়ী লর্ড ক্লাইভ্ ইংরেজ শক্তি যথাসাধ্য সুদৃঢ় করিতে মনোযোগ দিলেন। তদনুসারে লালদীঘি অঞ্চলের পুরাতন দুর্গটি পরিত্যক্ত হইল এবং 'আউট্‌রাম ঘাটে'র সন্নিকটে বর্ত্তমান দুর্গটি নির্ম্মিত হইল।

ইংলণ্ডের তদানীন্তন রাজা ছিলেন চতুর্থ উইলিয়ম্। তাঁহারই নামানুসারে এই নব-নির্ম্মিত দুর্গটির নাম হইল 'ফোর্ট উইলিয়ম্'।

বর্ত্তমান কলিকাতা মহানগরীতে যে কয়েকটী উল্লেখযোগ্য স্থান বা জিনিস রহিয়াছে 'ফোর্ট উইলিয়ম' তাহাদের অন্যতম। ইহা ছাড়া আরও দর্শনীয় জিনিসের অভাব নাই।

আধুনিক লালদীঘি ও তাহার চতুষ্পার্শ্বস্থ সৌধমালা—জেনারেল পোষ্ট-অফিস, সেক্রেটারিয়েট্ বিল্ডিং ইত্যাদি—আগন্তুক মাত্রেরই হৃদয়ে এক বিস্ময়ের ভাব জাগাইয়া দেয়। কিন্তু পলাশী যুদ্ধের পূর্ব্বেও কি এইরূপ ছিল? —না।

লালদীঘি নাম হইল কেন?

সাহেবদিগের পানীয় জলের নিমিত্ত লালদীঘি তখনও দীঘি এবং তখনও ইহার নাম 'লালদীঘি'ই ছিল। কিন্তু তাহার চেহারা ছিল অন্যরূপ।

দীঘির পশ্চিম তীরে রক্তবর্ণ-রঞ্জিত পুরাতন দুর্গ দণ্ডায়মান থাকিয়া ইংরেজদিগের ক্রম-বর্দ্ধমান শক্তির পরিচয় দিত। রক্ত-দুর্গের রক্তচ্ছবি দীঘির জলে প্রতিফলিত হইত, আর তাহাতেই স্বচ্ছ দীঘির জল লাল দেখাইত। লাল জল বলিয়া সেই হইতে দীঘির নাম হইল লালদীঘি।

লালদীঘির আশে পাশে ইংরেজদিগের বসতি। প্রধানতঃ ইহাই ছিল 'সাহেব-পাড়া'। কিন্তু বসতি হইলেও, সেগুলি তখনও এত গগন-স্পর্শী সৌধমালা ছিল না। তখনকার বসতি ছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন রকম।

লালদীঘির কাছে খাল?

লালদীঘির অনতিদূরে, আধুনিক কয়লাঘাট ও চাঁদপাল ঘাটের মধ্যবর্ত্তী স্থানের উপর দিয়া ভাগীরথী হইতে একটী খাল বরাবর পূর্ব্বদিকে বহিয়া যাইত। বড় বড় পণ্যবাহী নৌকাও সেই জলপথে বর্ত্তমান ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ক্রীক রো এবং বেলিয়াঘাটা প্রভৃতি অঞ্চল দিয়া ধাপার খালে যাইয়া পড়িত। লালদীঘির পার্শ্ববর্ত্তী ইংরেজ অধিবাসিগণ তাঁহাদের বাংলায় বসিয়া পণ্যবাহী নৌকা সমূহের উঁচু মাস্তুলগুলি মাত্র দেখিতে পাইতেন! আর আজ? আজ সে অঞ্চল শত শত যান-

বাহন ও সহস্র সহস্র লোক-জনের কলরবে মুখরিত। বড় বড় সৌধমালার মুক্ত বাতায়ন হইতে রাজপথের জনতা যেন পিপীলিকা-সঙ্ঘ বলিয়া অনুমান হয়।

'প্রাসাদ-নগরী' ও তাহার দর্শনীয় বস্তু

কলিকাতা মহানগরী এখন 'প্রাসাদ-নগরী' (City of Palaces) নামে পরিচিত। বাস্তবিক আজকাল বড়বাজারের প্রাসাদসমূহ, বালিগঞ্জের হর্ম্ম্যরাজি, ময়দানের পার্শ্ববর্ত্তী হোটেল ও বিপণি-শ্রেণী, হাইকোর্ট, গভর্ণমেণ্ট্ হাউস্ ইত্যাদি লক্ষ্য করিলে স্পষ্টই মনে হইবে, কলিকাতা বুঝি অগণিত প্রাসাদ-মালায় সুশোভিত।

বড়বাজার কলিকাতার ব্যবসায়ের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। গঙ্গার তীরে হাওড়ার বিরাট সেতুর পরেই বড়বাজার আরম্ভ হইয়াছে। উত্তর ও দক্ষিণ ভারত হইতে যাঁহারা কলিকাতায় আগমন করেন তাঁহাদিগকে বড়বাজারের মধ্য দিয়াই প্রথমে অগ্রসর হইতে হয়। বড়বাজারের বাণিজ্য মারোয়াড়ী বণিক্গণের হস্তগত। এখানে কত লক্ষপতি ব্যবসায়ী বাস করেন তাহার সংখ্যা নির্ণয় করা যায় না।

কলিকাতার এক প্রান্তে কয়েক বৎসরের মধ্যে সুশোভিত বালিগঞ্জ পল্লী গড়িয়া উঠিয়াছে। কিছুদিন পূর্ব্বেও এস্থান জঙ্গলময় ছিল। বহু সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত ব্যক্তি এখানে বাসস্থান নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এখানকার রাস্তাগুলি সুপ্রশস্ত, বাড়ীগুলিও নূতন ধরণে গঠিত। মাঝে মাঝে বড় বড় পার্ক আছে।

বালিগঞ্জের এক প্রান্তে সুপ্রসিদ্ধ ঢাকুরিয়া লেক। অপরাহ্নে ও সন্ধ্যায় লেকের তীরে বহু লোকের সমাগম হয়। জ্যোৎস্না-রাত্রিতে লেক যেন স্বপ্নপুরীর মত শোভায় ঝক্‌মক্ করিতে থাকে।

কলিকাতার প্রশস্ত রাজপথগুলির মধ্যে চৌরঙ্গীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এই পথের একপাশে বড় বড় সৌধমালা, অপর পারে বিশাল ময়দান। চৌরঙ্গীতে কয়েকটী বিখ্যাত দোকান আছে। এই পল্লীতে প্রধানতঃ ইউরোপীয়গণ বাস করেন।

পরেশনাথের মন্দির কলিকাতার একটী প্রধান দর্শনীয় স্থান। বিবিধ বর্ণের কাচ ও প্রস্তরখণ্ডের সাহায্যে মন্দিরটী নির্ম্মিত। ইহার চতুর্দ্দিকে অতি সুদৃশ্য উদ্যান ও জলাশয়। মন্দির-মধ্যে জৈন তীর্থঙ্কর শীতলানাথজীর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত। কারুকার্য্য ও রমণীয়তায় মন্দির ও তৎসংলগ্ন উদ্যানটী অপূর্ব্ব।

রাজা রাজেন্দ্র মল্লিকের মর্ম্মর-প্রাসাদ কলিকাতার আর একটী দর্শনীয় বস্তু। দেশ-বিদেশের বহু মূল্যবান্ চিত্র ও ভাস্কর-মূর্ত্তি এখানে সযত্নে সংগৃহীত আছে। প্রাসাদসংলগ্ন সুদৃশ্য উদ্যানের কৃত্রিম পাহাড়, হ্রদ ও ঝরণায় শিল্পীর অপরূপ কৃতিত্ব পরিস্ফুট। উদ্যানের এক অংশে একটী চিড়িয়াখানা। রঙ্‌-বেরঙের বিবিধ পক্ষীর কল-গুঞ্জনে চিড়িয়াখানাটী মুখরিত। প্রতিদিন শত শত কাঙালীও এখানে আহার পাইয়া থাকে।

কলিকাতার হাইকোর্ট অপর একটী দর্শনীয় স্থান। ইহার উচ্চ চূড়াগুলি এবং বিরাট আকৃতি দর্শকমাত্রের অন্তঃকরণেই একটা

গাম্ভীর্য্যের অনুভূতি জাগাইয়া দেয়। এই বিরাট বিচারালয়ের বয়স প্রায় সত্তর বৎসর হইয়াছে, তথাপি ইহা কিছুমাত্র জরাজীর্ণ বলিয়া মনে হয় না।

'গভর্ণমেণ্ট্ হাউস্' বা লাট সাহেবের বাড়ী

একসময়ে ইহা ভারতের বড়লাটের আবাস-বাটীরূপে ব্যবহৃত হইত। এখন এখানে বাঙ্লার লাট-সাহেব বাস করেন। ১৮০২ খৃষ্টাব্দে লর্ড ওয়েলেস্লি ইহা নির্ম্মাণ করেন।

'হগ্ সাহেবের বাজার' বা 'নিউ মার্কেট্'

ইহা ধর্ম্মতলার দক্ষিণে অবস্থিত। 'বাজার' শব্দটি সাধারণতঃ আমাদের মনে একটা বিশৃঙ্খলতা ও গোলমালের ভাব জাগাইয়া দেয়, কিন্তু এই আদর্শ বাজারটী সেরূপ নহে। এমন সুশৃঙ্খল ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন বাজার ভারতবর্ষের আর কোনও স্থানে দেখিতে পাওয়া যাইবে কিনা সন্দেহ। একসময়ে স্যার ষ্টুয়ার্ট হগ্ কলিকাতায় পুলিশ কমিশনার ও মিউনিসিপ্যালিটির চেয়ারম্যান্ ছিলেন। এই বাজারটী তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত।

'ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল হল'

ইহা কলিকাতার গর্ব্বের বস্তু। মহারাণী ভিক্টোরিয়ার স্মৃতিরক্ষার জন্য প্রায় ৭৬ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ময়দানের দক্ষিণে ইহা তৈয়ারি হইয়াছিল। ইহা বিখ্যাত শিল্পীদের দ্বারা শ্বেত পাথরে গঠিত। ইহার অপরূপ সৌন্দর্য্য সকলকেই মুগ্ধ করে।

যাদুঘর বা মিউজিয়ম

যাত্বঘর কলিকাতার আর একটী বিখ্যাত দর্শনীয় বস্তু। এখানে অনেক মৃত জীবজন্তুর কঙ্কাল, নানাবিধ প্রস্তরমূর্ত্তি এবং ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্ন সংগ্রহ করা আছে। অতীতের পৃথিবী সম্বন্ধে কিছু আভাস পাইতে হইলে যাত্বঘর দেখিতেই হইবে। তুইশত বৎসর পূর্ব্বে নাদির শাহ্‌ ভারতে আসিয়া দিল্লী হইতে যে পান্নার পেয়ালাটী লুণ্ঠন করিয়া লইয়াছিলেন, সেই পেয়ালাটীও এখানে রক্ষিত আছে।

অন্যান্য দর্শনীয় স্থান

কলিকাতায় আর একটী দেখিবার জায়গা চিড়িয়াখানা। ইহা খিদিরপুর পুলের নিকটে অবস্থিত। নানাদেশের জীবিত জীব-জন্তু এখানে দেখিতে পাওয়া যায়।

অধিবাসীদের আমোদ-প্রমোদ ও ভ্রমণের জন্য কলিকাতায় কয়েকটী মুক্ত স্থানের বন্দোবস্তও রহিয়াছে। দেশবন্ধু পার্ক, কর্ণওয়ালিশ স্কোয়ার, কলেজ স্কোয়ার, ওয়েলিংটন স্কোয়ার, কার্জ্জন পার্ক, ইডেন গার্ডেন ইত্যাদি[illegible]র মধ্যে বিখ্যাত।

কার্জ্জন পার্ক ময়দানের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে এবং ইডেন গার্ডেন উত্তর-পশ্চিম কোণে অবস্থিত। বড়লাট লর্ড অক্‌ল্যাণ্ডের ভগ্নী মিস্‌ ইডেনের চেষ্টায় বাগানটী প্রতিষ্ঠিত বলিয়া ইহা আজও ইডেন গার্ডেন নামে সুপরিচিত।

কলিকাতায় বিবিধ ধর্ম্মাবলম্বীদিগের কয়েকটি ধর্ম্মপ্রতিষ্ঠানও

আছে। তাহার মধ্যে খ্রীষ্টান্‌দিগের সেণ্ট্ পল্ গীর্জ্জা, সেণ্ট্ জন্ গীর্জ্জা, সেণ্ট্ জেম্‌স্ গীর্জ্জা; মুসলমানদিগের নাখোদা মস্‌জিদ্, জুম্মা পীর, মৌলাআলী, টীপু সুলতানের মস্‌জিদ্; হিন্দু-দিগের কালীঘাটের কালী-মন্দির, নিমতলার আনন্দ-ময়ীর মন্দির, বাগবাজারের মদনমোহনতলা, কালীঘাটের নকুলেশ্বর, গৌড়ীয় মঠ; এবং জৈনদের পরেশনাথের মন্দির ইত্যাদি বিখ্যাত।

১। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল
২। চিড়িয়াখানা
৩। বিশ্ববিদ্যালয়
৪। কালীঘাটের মন্দির

কালীঘাটের কালী হিন্দুর অন্যতম প্রধান দেবতা। কালীঘাট একটী পীঠস্থান। কথিত আছে, দক্ষযজ্ঞে সতী বিনা-নিমন্ত্রণে যাইয়া পতিনিন্দা শুনিয়া অপমানিত বোধ করেন এবং সেইখানেই দেহত্যাগ করেন। তখন মহাদেব তাঁহাকে কাঁধে লইয়া

উন্মত্তের মত সারা পৃথিবী ভ্রমণ করিতে থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু শিবের ভার মোচন করিবার জন্য বিষ্ণুচক্রে সতীর দেহ খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিতে থাকেন। তাঁহার সেই খণ্ড-বিখণ্ড দেহ যে সকল স্থানে পতিত হয় সেই স্থানগুলি হিন্দুর নিকট পবিত্র পীঠস্থান হইয়া আছে। কালীঘাটে সতীর দক্ষিণ পদের চারিটি অঙ্গুলি পতিত হইয়াছিল।

যশোহরের অধিপতি রাজা প্রতাপাদিত্যের পিতৃব্য বসন্ত রায় কালীঘাটের আদি মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। বর্ত্তমান মন্দিরটি বড়িশার সাবর্ণ চৌধুরী বংশের সন্তোষ রায় শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। বর্ত্তমান প্রেসিডেন্সি জেলখানার দক্ষিণে প্রাচীন আদি মন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল। শুনা যায়, মারাঠা দস্যু বর্গীরা আসিয়া সেখানে নরবলি পর্য্যন্ত দিয়া গিয়াছিল।

কলিকাতার গড়ের মাঠে অক্টারলোনী মনুমেণ্ট্ এবং ভাগীরথীর উপরে ভাসমান সেতু হাওড়ার পুল, এ দুইটিও দর্শনীয় বস্তু। স্যার ডেভিড অক্টারলোনী অসমসাহসিকতার সহিত নেপাল যুদ্ধে নেপালীদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহারই স্মৃতিরক্ষার জন্য অক্টারলোনী মনুমেণ্ট্ নির্ম্মিত হইয়াছে। ইহা ১৫২ ফুট উচ্চ, ইহার মধ্য দিয়া সিঁড়ি ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিয়া গিয়াছে। ইহার উপর হইতে সমস্ত কলিকাতা ও তাহার চারিদিককার স্থানগুলি একখানি ছবির মত সুন্দর দেখায়।

এই সকল দর্শনীয় জায়গা ছাড়া উচ্চশিক্ষার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কেন্দ্র হিসাবেও কলিকাতার মূল্য নিতান্ত কম নহে। এখানে একটি বিশ্ববিদ্যালয়, কয়েকটি কলেজ ও অনেকগুলি বিদ্যালয় আছে। ইহা ছাড়া পাঁচ শতেরও অধিক প্রাথমিক বিদ্যালয় এখানে আছে। মেডিকেল স্কুল, মেডিকেল কলেজ, আর্ট স্কুল, সঙ্গীত-শিক্ষার প্রতিষ্ঠান, মূকবধির বিদ্যালয় প্রভৃতি নানাবিধ শিক্ষায়তন ও কলিকাতা শহরের বহু নর-নারীকে সুশিক্ষিত করিতেছে।

৫। হাইকোর্ট ৬। হাওড়ার পুল
৭। পরেশনাথের মন্দির
৮। বেলুড় মঠ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত। ইহা দীর্ঘকাল যাবৎ সোনার বাঙ্‌লার সন্তানদিগকে সুশিক্ষিত করিয়া যথার্থ 'সোনার ছেলে' করিবার জন্য যেভাবে চেষ্টা করিয়া

আসিতেছে, তাহা সত্যই প্রশংসার বিষয়। গোলদীঘির পশ্চিম তীরে অবস্থিত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'সিনেট হাউসের' পাদমূলে আমাদের মস্তক স্বভাবতঃই নত হইয়া পড়ে, কারণ এই বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষাদান করিয়া বাঙালী জাতিকে উন্নত করিয়া তুলিতেছে।

কলিকাতার অতুল ঐশ্বর্য্য ও সমৃদ্ধির কথা, তাহার শিক্ষা ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের কথা, তাহার বিশ্ব-বিখ্যাত মনীষীদিগের কথা, আজ যত কিছুই চিন্তা করিনা কেন, আমাদের কয়জনের হৃদয়ে একথা উদয় হয় যে এই কলিকাতা একদিন বাঘ আর সাপে পরিপূর্ণ জঙ্গল বিশেষ ছিল! আর ছিল তিনটি মাত্র ক্ষুদ্র গ্রাম—সূতানুটী, কলিকাতা ও গোবিন্দপুর। অতীতের সেই বনভূমি আর সামান্য গ্রাম তিনখানি লইয়া আজ সোনার বাঙলার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নগরী কলিকাতা নির্ম্মিত হইয়াছে।

মুর্শিদাবাদ

বাঙলার অস্তগিরি

বাঙলার বর্ত্তমান রাজধানী কলিকাতা, আর অতীত রাজধানী মুর্শিদাবাদ। কলিকাতা বাঙলাদেশের উদয়াচল, এবং মুর্শিদাবাদ বাঙলার অস্তগিরি। উদয়াচল বলিয়া কলিকাতার চিত্র উজ্জ্বল ও সমৃদ্ধ; কিন্তু মুর্শিদাবাদ অস্তগিরি,—সেইজন্য তাহার চিত্র আজ মলিন।

মুর্শিদাবাদের ইতিহাস বড় করুণ ও বিষাদময়। মাত্র এক শত বৎসরেরও কম সময়ের মধ্যে মুর্শিদাবাদের কপাল অতি শোচনীয়ভাবে ভাঙিয়া গিয়াছে!

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দের ২২শে জুন, বুধবার পর্য্যন্ত এই মুর্শিদাবাদ ছিল বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন অধিপতির গৌরবময় রাজধানী। সেইদিন পর্য্যন্ত মুর্শিদাবাদই ছিল বাঙ্‌লার ভাগ্যবিধাতা। কিন্তু পরদিন ২৩শে জুন, বৃহস্পতিবার মুর্শিদাবাদের সেই গৌরব-চূড়া খসিয়া পড়িল,—পলাশীর আম্রবনে নবাব সিরাজ-উদ্দৌলার অতি শোচনীয়ভাবে পতন হইল। সঙ্গে সঙ্গে অতি সমৃদ্ধ একটা মহানগরী চির-দিনের জন্য শ্মশানে পরিণত হইল।

আকাশে চন্দ্র-সূর্য্য অস্ত যায়, তারপর আবার তাহাদের উদয়ও হইয়া থাকে। কিন্তু বাঙ্‌লার চন্দ্র-সূর্য্য মুর্শিদাবাদ হইতে যে অস্তমিত হইল আর কোনদিন তাহার উদয় হইল না।

মুর্শিদাবাদ যখন রাজধানী ছিল তখন সেখানে ছিল বড় বড় সব প্রাসাদ, আর সর্ব্বদাই সেই নগরী আনন্দ কলরবে মুখরিত থাকিত। কিন্তু মুর্শিদাবাদের সেই সমৃদ্ধি আজ আর নাই, সেই অগণিত প্রাসাদশ্রেণী নাই, সেই সৈন্যবাহিনী নাই, সেই রণ-হুঙ্কার নাই। আছে শুধু মুর্শিদাবাদের সেই নাম, সেই ভাগীরথী, সেই রাজপথ, আর এখানে-সেখানে অতীতের অসংখ্য স্মৃতি-চিহ্ন।

মুর্শিদাবাদের পুরাতন নাম মুখ্‌সুদাবাদ বা মুখ্‌সুসাবাদ। এই নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে কয়েকটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে। শুনা যায়, মুখ্‌সুদন দাস (বা মধুসূদন দাস) নামে সেখানে এক পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহার প্রচুর ঐশ্বর্য্য ছিল।

সেই অপরিমিত ঐশ্বর্য্য ব্যয় করিয়া তিনি এই নগর গড়িয়া তোলেন। সুতরাং তাঁহারই নাম অনুসারে ইহার নাম হইয়াছে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, মুখ্সুদন দাস নামে একজন বিখ্যাত সন্ন্যাসী এখানে বাস করিতেন। তিনি শিখ-গুরু নানকের শিষ্য ছিলেন। একবার গৌড়েশ্বর হুসেন শাহের খুব কঠিন পীড়া হয়। সন্ন্যাসী মুখ্সুদন দাসের সুচিকিৎসায় ও আশীর্ব্বাদে তিনি রোগমুক্ত হন। আরোগ্য লাভ করিয়া হুসেন শাহ্ তাঁহাকে প্রচুর ভূ-সম্পত্তি প্রদান করেন। তাহাই কালক্রমে এই নগরে পরিণত হয় এবং সেই অবধি ইহার নাম হয় মুখ্সুদাবাদ অথবা মুখ্সুসাবাদ।

আওরংজেব যখন ভারতবর্ষের সম্রাট্, বাঙ্লাদেশের রাজধানী তখন জাহাঙ্গীর-নগর বা ঢাকা। আওরংজেবের পৌত্র আজিম উশ্শান তখন বাঙ্লার সুবাদার বা নবাব-নাজিম। মুর্শিদকুলী খাঁ নামে এক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি ব্যক্তি তখন বাঙ্লার দেওয়ান হিসাবে ঢাকায় বাস করিতেছিলেন। সুবাদার আজিম উশ্শানের সহিত তাঁহার ভাল বনি-বনাও হইতেছিল না। অবশেষে এই মনোমালিন্য ক্রমে তীব্র হইয়া উঠিলে দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ তাঁহার দেওয়ানী বিভাগের দপ্তরখানা মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করেন।

সম্রাট্ আওরংজেবের মৃত্যুর পর সম্রাট্ ফরুখ্শিয়র যখন ভারতের অধিপতি, দেওয়ান মুর্শিদকুলী খাঁ সেই সময় বাঙ্লা, বিহার ও উড়িষ্যার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। সুতরাং

তখন তিনিই হইলেন বাঙ্‌লার একচ্ছত্র অধিপতি। নবাব হইয়া তিনি তাঁহার রাজধানীর নাম বদল করিলেন—মুখ্‌সুদাবাদের নাম হইল মুর্শিদাবাদ।

মুর্শিদকুলী খাঁ

কথিত আছে, মুর্শিদকুলী খাঁ ব্রাহ্মণের সন্তান ছিলেন। দারিদ্র্যের জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার পিতা এক ইরাণী ব্যবসায়ীর নিকট পুত্রকে বিক্রয় করেন। তখন হইতে তাঁহার মুসলমানী নাম হইল মহম্মদ হাজী। দিল্লীর বাদশাহ্‌ তাঁহার অসাধারণ কর্ম্মপটুতায় সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে মুর্শিদকুলী খাঁ উপাধি প্রদান করিলেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ একজন সুশাসক ছিলেন। দেশ-শাসনের জন্য তিনি নানাবিধ সুব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার সুশাসনে চোর-ডাকাতের উপদ্রব অনেক পরিমাণে দূর হইয়াছিল। ন্যায়-বিচারের প্রতি তাঁহার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ছিল। বিচার-কার্য্যের মর্য্যাদা-রক্ষার জন্য তিনি এত বেশী মনোযোগী ছিলেন যে নিজের একমাত্র পুত্রকেও তিনি প্রাণ দণ্ডে দণ্ডিত করিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই।

বিলাসিতা ও অলসতা ইনি একেবারেই পছন্দ করিতেন না। ধার্ম্মিক ও বিদ্বান্‌ বলিয়া তাঁহার খ্যাতি ছিল। পাছে প্রজাদের কষ্ট হয় এই ভয়ে তিনি ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি পাশ্চাত্য বণিক্‌দিগকে বাঙ্‌লার খাদ্য-শস্য তাহাদের ইচ্ছামত লইয়া

যাইতে দিতেন না। কিন্তু রাজকর আদায়ে তিনি অতিরিক্ত কঠোরতা অবলম্বন করিতেন।

মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার হইয়া তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদকে সকল বিষয়ে রাজধানীর উপযোগী করিয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কেল্লা, প্রাসাদ, মস্‌জিদ্, দরবার-গৃহ প্রভৃতি তৈয়ারী হইল, পথ-ঘাটের উন্নতি হইল—রাজধানী আলোকমালায় সুসজ্জিত হইল।

মুর্শিদাবাদের সেই সব প্রাচীন কীর্ত্তির অধিকাংশই এখন লোপ পাইয়াছে। মাঝে মাঝে দুই একটি ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তি প্রাচীন ঐশ্বর্য্যের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মুর্শিদাবাদ শহরের পূর্ব্ব-অংশ 'লালবাজার' নামে পরিচিত। কথিত আছে, নবাবের পাশ্চাত্য কর্ম্মচারিগণ শহরের এই অংশে বাস করিতেন। সেজন্য 'লালবাজার' নামে ইহা খ্যাতি লাভ করিয়াছে।

লালবাজারে নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর জীবন্ত কীর্ত্তি—কাট্‌রার মস্‌জিদ্। মুসলমানগণের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ তীর্থস্থান মক্কার সুবৃহৎ মস্‌জিদের অনুকরণে ইহা নির্ম্মিত। এত বড় মস্‌জিদ্ মুসলমান-জগতে অতি অল্পই দৃষ্টিগোচর হইত। সে কালে সাত শত ধার্ম্মিক কোরাণ-পাঠক ইহাতে বাস করিতেন। ভূমিকম্পে মস্‌জিদ্‌টির অত্যন্ত ক্ষতি হইয়াছে, কিন্তু প্রাচীন দ্রষ্টব্য স্থানের মধ্যে কাট্‌রার মস্‌জিদ্ আজও সুবিখ্যাত। মৃত্যুর পূর্ব্বে মুর্শিদকুলী খাঁ বলিয়া গিয়াছিলেন, তাঁহাকে যেন ঐ মস্‌জিদের

নিম্নে একটী ক্ষুদ্র ঘরে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সেই অভিলাষ সম্পূর্ণভাবে পরিপূর্ণ করা হইয়াছে। তাঁহার নশ্বর দেহ মস্‌জিদের সোপানশ্রেণীর নিম্নে ক্ষুদ্র কক্ষ-মধ্যে নীরবে শান্তিলাভ করিতেছে। মুর্শিদাবাদের অধিবাসিগণ আজও সগর্ব্বে ও শ্রদ্ধার সহিত দর্শকমাত্রকেই মুর্শিদাবাদের স্থাপয়িতা নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর কবর দেখাইয়া দেয়।

ইহার অনতিদূরে নবাব-নাজিমদিগের তোপখানা। মুর্শিদ-কুলী খাঁ নগর রক্ষার জন্য তোপ তৈয়ারীর প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া এক বিরাট তোপখানা স্থাপন করিয়াছিলেন। তাঁহার স্মৃতি সজাগ রাখিবার জন্য আজও সেখানে এক প্রকাণ্ড কামান পড়িয়া আছে। তাহা লম্বায় ১২ হাত এবং চওড়ায় ৩ হাত; ওজনে তাহা দুইশত মণেরও অধিক। এই কামান একবার দাগিতে ২৮ সের বারুদ লাগিত।

কামানটির নাম—'জাহান্-কোষা' বা 'বিশ্বজয়ী'। প্রাচীন জাহাঙ্গীর নগর বা ঢাকা শহরের জনার্দ্দন কর্ম্মকার ইহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

তোপখানার কোনও চিহ্নই আজ বর্ত্তমান নাই। সম্ভবতঃ জাহান্‌কোষার অসাধারণ ওজনের জন্যই ইহা আজও সেখানে রহিয়া গিয়াছে। এককালে ইহা ভূমিতেই পড়িয়া ছিল সন্দেহ নাই। কিন্তু ক্রমে জাহান্‌কোষার নিম্ন হইতে এক অশ্বত্থ গাছের জন্ম হয়। গাছটি ক্রমশঃ বড় হইয়া তাহার দুইটি গুঁড়ির সাহায্যে ভূমি হইতে কামানটিকে প্রায়

এক হাত উঁচু করিয়া তুলিয়াছে। ইহা যেন প্রকৃতির এক অপরূপ লীলা! মুর্শিদকুলী খাঁর সামরিক গৌরবের একটা চিহ্নকে ধ্বংসমুখ হইতে রক্ষা করিবার জন্য যেন এক ব্যাকুল
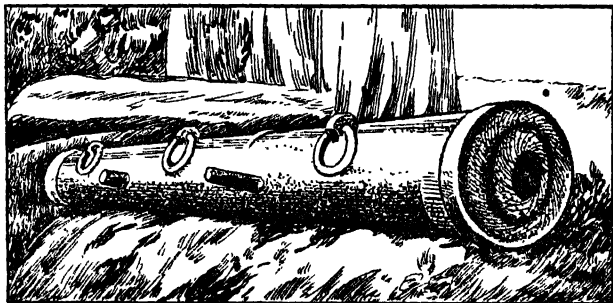
জাহান্-কোষা

প্রয়াস!—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সেই গর্ব্বের বস্তু জাহান্‌কোষা আজও সাধারণের সশ্রদ্ধ পুষ্পাঞ্জলি পাইয়া আসিতেছে।

পরবর্ত্তী নবাব

মুর্শিদকুলী খাঁর মৃত্যুর পরে তাঁহার জামাতা সুজাউদ্দীন খাঁ বা সুজাউদ্দৌলা সুবাদার হইলেন। তিনি খুব বিলাসী ছিলেন, রাজকার্য্যে কখনও মন দিতেন না। কিন্তু মুর্শিদাবাদ সুন্দর করিয়া সাজাইয়া তুলিতে তিনিও যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলী খাঁর নির্ম্মিত প্রাসাদসমূহ তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। সেইজন্য তিনি অনেক কিছু ভাঙ্গিয়া-চূরিয়া নূতন করিয়া নির্ম্মাণ করাইলেন।

ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে, মুর্শিদাবাদের বিপরীত দিকে ডাহাপাড়া নামে এখনও একটি গ্রাম আছে। নবাব সুজাউদ্দৌলা সেখানে ফর্হাবাগ নামে এক প্রমোদ-কানন নির্ম্মাণ করাইলেন। মৃত্যুর পরে তাঁহাকে সেই ফর্হাবাগের নিকটেই সমাহিত করা হয়। এখন সে স্থান রোশনীবাগ (আলোক-কানন) নামে বিখ্যাত।

নবাব সুজাউদ্দৌলার মৃত্যুর পর সুবাদার হইলেন তাঁহার পুত্র সরফরাজ খাঁ। কিন্তু ভাগ্যহীন সরফরাজ খাঁ এক বৎসর মাত্র নবাবী করিয়াছিলেন। তাঁহারই মন্ত্রণা-সভার জগৎ শেঠ, দুর্লভরাম, আলিবর্দ্দী খাঁ প্রভৃতি মন্ত্রিগণ তাঁহার বিরুদ্ধে এক বিপুল ষড়যন্ত্র করেন। অবশেষে মুর্শিদাবাদ হইতে বাইশ মাইল দূরে গিরিয়ার যুদ্ধে তিনি নিহত হইলেন। মুর্শিদাবাদের শূন্য সিংহাসনে আরোহণ করিলেন আলিবর্দ্দী খাঁ।

আলিবর্দ্দী খাঁর রাজত্বকাল মারাঠা দস্যু বর্গীদের অত্যাচার কাহিনীতে পরিপূর্ণ। তাঁহার জীবন প্রধানতঃ সেই দুশ্চিন্তাতেই কাটিয়াছিল। আশী বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হয়; তখন মসনদে আরোহণ করিলেন তাঁহার দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা। তাঁহার বয়স তখন আঠার বৎসর মাত্র।

সিরাজউদ্দৌলা

এই তরুণ নবাবের রাজত্বকাল অতি করুণ ঘটনায় পরিপূর্ণ। মুর্শিদাবাদের উদয় ও অস্তের ছবি আমরা তাঁহারই

রাজত্বে সুন্দর ভাবে দেখিতে পাই। সেনাপতি মোহনলাল ও মীরমদনের বিশ্বাস-পরায়ণতা ও আত্মত্যাগ, আর বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর, উমিচাঁদ ও জগৎশেঠের জঘন্য ষড়যন্ত্র ও কৃতঘ্নতা,—স্বর্গ ও নরকের এই দুইটী বিপরীত চিত্র নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজত্বকালে যেভাবে পরিস্ফুট দেখিতে পাই পৃথিবীতে বুঝি তাহার তুলনা নাই।

সিরাজউদ্দৌলা নবাব হইয়া দেখিলেন, ইংরেজ বণিক্‌গণ তাঁহার শাসনকার্য্যের বাধা-স্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। নবাব আলিবর্দ্দী তাঁহাদিগকে রাজ্য-মধ্যে দুর্গ নির্ম্মাণ করিতে নিষেধ করিয়া গিয়াছিলেন। কিন্তু ইংরেজগণ তাহাতে কর্ণপাত করিলেন না। সিরাজউদ্দৌলাও নিষেধ করিলেন; কিন্তু তাহাও বৃথা হইল। বাণিজ্য সম্পর্কে তাঁহাদিগকে যে সকল সুবিধা দেওয়া হইয়াছিল ইংরেজগণ তাহারও অপব্যবহার করিতে লাগিলেন। এই সব কারণে সিরাজউদ্দৌলা ক্রুদ্ধ হইয়া ১৭৫৬ খৃষ্টাব্দের জুন মাসে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠি অবরোধ করিলেন। অবশেষে তাঁহাদের অধিকৃত কলিকাতাও দখল করিয়া লইলেন। এইভাবে ইংরেজ ও নবাবের মধ্যে ভীষণ বিবাদের সূচনা হইল!

তরুণ নবাব তাঁহার সরল বুদ্ধিতে কোনও ষড়যন্ত্রের কল্পনাও করিতে পারিলেন না। অনুচরদিগকে পরিপূর্ণ বিশ্বাস করিয়া তিনি পলাশীর রণক্ষেত্রে ইংরেজের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর ও দুর্লভরাম প্রায়

পঁয়তাল্লিশ হাজার নবাবী সৈন্য লইয়া, ইংরেজের সহিত পূর্ব্ব পরামর্শ অনুযায়ী সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয়ভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ফল যাহা হইবার তাহা অতি শোচনীয় ভাবেই ফলিল। নবাব সিরাজউদ্দৌলার রাজমুকুট সেইদিনই ধূলায় লুটাইয়া পড়িল, মুর্শিদাবাদের গৌরবোজ্জ্বল দৃশ্য সেইদিন হইতে মলিন হইয়া গেল।

পরাজয়ের পরদিনই—২৪এ জুন, শুক্রবার সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বেগম লুৎফউন্নিসা ও চারি বৎসরের শিশুকন্যাকে লইয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদ হইতে নৌকায় করিয়া রাজমহলের দিকে পলায়ন করিলেন। মুর্শিদাবাদের শূন্য সিংহাসন হাহাকার করিতে লাগিল।

পর পর তিন দিন তিন রাত উপবাসে থাকিয়া রাজ্যহীন সিরাজ একদিন এক ফকিরের কাছে খাদ্য প্রার্থনা করিলেন। ফকির তাঁহাকে খিচুড়ী রাঁধিয়া দিতে রাজি হইল। কিন্তু দুর্ভাগ্য এখানেও তাঁহার অনুগামী হইয়াছিল। সুতরাং ফল হইল অন্যরূপ।

ফকির তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, তাই সিরাজকে খাদ্য দানের আশ্বাস দিয়া প্রচুর পুরস্কার পাইবার আশায় সে তখনই মীরজাফরের জামাতা মীর কাসিমের নিকট খবর পাঠাইল।

সিরাজের সব শেষ

অবিলম্বে সিরাজ সপরিবারে বন্দী হইলেন। তাহার

পর কিছুকাল বন্দী থাকিয়া মীরজাফরের পুত্র মীরণের প্ররোচনায় মহম্মদী বেগ নামে এক কৃতঘ্ন নিষ্ঠুর ব্যক্তির হস্তে তিনি নিহত হন। এইরূপে মাত্র কুড়ি বৎসর বয়সে তরুণ নবাব সিরাজউদ্দৌলার জীবনান্ত ঘটিল।

বৃদ্ধ নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ ছেলেবেলা হইতে এই মহম্মদী বেগকে যত্নের সহিত মানুষ করিয়াছিলেন। সেই মহম্মদী বেগ, বৃদ্ধের নয়ন-মণি সিরাজউদ্দৌলাকে হত্যা করিয়া কৃতজ্ঞতার ঋণ অতি বীভৎসভাবে পরিশোধ করিল। সিরাজের হত্যাস্থান এখনও সেই জন্য 'নিমকহারামী দেউড়ী' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদের অধিবাসীরা এখনও জাফরগঞ্জ প্রাসাদের উত্তর-পূর্ব্ব কোণে সেই হত্যাস্থান অতি সকরুণ ভাবে দেখাইয়া দেয়।

সিরাজ নিহত হইলেন; কিন্তু ষড়যন্ত্র-কারিগণ তখনও বুঝি তৃপ্তিলাভ করিতে পারে নাই। সিরাজের মৃতদেহ হস্তিপৃষ্ঠে লইয়া সারা শহরে ঘুরাইয়া আনা হইল। সিরাজের মায়ের বাড়ীর সম্মুখ দিয়াও শোভাযাত্রা লইয়া যাওয়া হইয়াছিল।

সিরাজের পতন হইল, ইংরেজের অনুগ্রহে মীরজাফর তাঁহার বিশ্বাসঘাতকতার পুরস্কার হিসাবে মুর্শিদাবাদের মস্‌নদ্‌ লাভ করিলেন। তাঁহারই নাম অনুসারে জাফরগঞ্জের নামকরণ হইয়াছিল। জাফরগঞ্জের প্রাসাদে মীরণের বংশধরগণ আজও বসবাস করিতেছেন।

বৃদ্ধ-নবাব আলিবর্দ্দী খাঁ খোশবাগে সমাহিত হইয়াছিলেন। নবাব সিরাজউদ্দৌলাও মাতামহের পার্শ্বে সমাহিত হইলেন। সিরাজউদ্দৌলার একটি ভাই ছিলেন, তিনি তখন মাত্র পনেরো বৎসরের বালক। তাঁহার নাম—মির্জ্জা মেহেদী। ভবিষ্যতে যদি কোন দিন তিনি সিংহাসনের দাবী করিয়া বসেন, এই আশঙ্কায় মীরজাফর সর্ব্বদা উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাঁহারই আদেশে তাঁহার পুত্র মীরণ অতি নিষ্ঠুরভাবে মির্জ্জা মেহেদীরও প্রাণনাশ করিল। সিরাজের সমাধির পূর্ব্বদিকে তাঁহার ভ্রাতা মির্জ্জা মেহেদীর সমাধি বর্ত্তমান থাকিয়া মীরণের দ্বিতীয় হত্যাকাণ্ডের কথা আজও সকলকে স্মরণ করাইয়া দেয়। খোশ্‌বাগে আরও কতকগুলি সমাধি দেখিতে পাওয়া যায়। সিরাজের পত্নী বেগম লুৎফউন্নিসার সমাধি তন্মধ্যে একটী।

মীরণের হত্যা-প্রবৃত্তি বুঝি ইহাতেও মিটে নাই। সিরাজের মাতা এবং মাসীমাতাকেও মীরণ নৌকা-পথে জলে ডুবাইয়া হত্যা করিল। কথিত আছে, মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহারা মীরণকে অভিশাপ দিয়াছিলেন, 'বজ্রাঘাতে তোর মৃত্যু হউক'। পুত্রহারা জননীর সেই অভিসম্পাত ব্যর্থ হয় নাই। বজ্রাঘাতেই মীরণের মৃত্যু হইয়াছিল। মীরজাফর জীবিত থাকিতেই পুত্রের মৃত্যু দেখিয়া গেলেন।

মীরজাফর সিংহাসনে বসিয়া কি করিলেন, তাঁহার পরে আর কে কতদিন রাজত্ব করিয়াছিলেন, সে সব ইতিহাসের

কথা। তাঁহারা মুর্শিদাবাদে নবাবী করিলেও বাঙ্‌লার শাসনভার ক্রমে ক্রমে ইংরেজের হস্তগত হইল।

দ্রষ্টব্য স্থান

মুর্শিদাবাদে রাজপ্রাসাদ 'হাজার দুয়ারী' এখনও দণ্ডায়মান রহিয়াছে। ইহাতে এখনও অসংখ্য বহুমূল্য চিত্র, অস্ত্রশস্ত্র এবং মূল্যবান্ ও সুদৃশ্য আসবাবপত্র দেখিতে পাওয়া যায়। অদূরে মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুরের বর্ত্তমান রাজপ্রাসাদ।

হাজার দুয়ারী
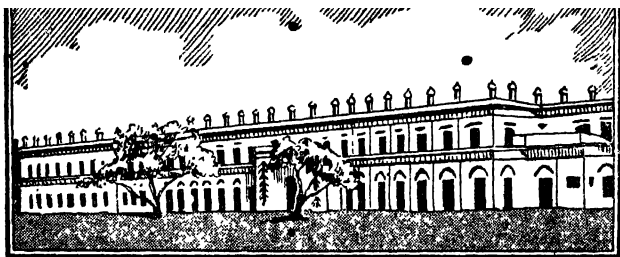
'হাজার দুয়ারী'র উত্তরে 'ইমাম্‌বাড়া' নামে প্রসিদ্ধ পুরাতন সৌধ। নবাব-নাজিম মন্‌সুর আলি ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইহা নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। 'হাজার দুয়ারী' নির্ম্মিত হয় সুদীর্ঘ নয় বৎসরে, আর ইমাম্‌বাড়া নির্ম্মিত হয় মাত্র আট নয় মাসের মধ্যে। মহরমের সময় এই ইমাম্‌বাড়ায় খুব ধূম-ধাম হইয়া থাকে। ইমাম্‌বাড়ার নিকটে নবাব বাহাদুরের স্কুল।

'হাজার- দুয়ারীর' দক্ষিণ-পূর্ব্বে প্রায় দেড়মাইল দূরে 'মতিঝিল' নামে প্রসিদ্ধ জলাশয়। ইহার আকৃতি ঘোড়ার খুরের মত। কেহ কেহ বলেন, ইঁট তৈয়ারী করিতে মাটির আবশ্যক হওয়ায় এই স্থানটি কাটা হইয়াছিল এবং তাহাতেই এই 'মতিঝিলে'র উৎপত্তি। আবার কেহ বলেন, ইহা ভাগীরথীর একটি পুরাতন খাদমাত্র। / মতিঝিল যে ভাবেই গড়িয়া উঠুক না কেন, ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নবাব আলিবর্দ্দীর ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা নওয়াজেস্ মহম্মদ খাঁ ইহার পশ্চিম তীরে একটি প্রাসাদ, মস্‌জিদ্ ও বাগান বাড়ী ইত্যাদি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। এখন তাহার ভগ্নাবশেষ ও মস্‌জিদ্‌টি দেখিতে পাওয়া যায়। নবাব সিরাজউদ্দৌলা এই মতিঝিলের প্রাসাদ হইতেই পলাশীর যুদ্ধে যাত্রা করিয়াছিলেন। দেওয়ানী গ্রহণের পরে এই মতিঝিল প্রাসাদেই ক্লাইভ বিরাট জাঁক জমকের সহিত উৎসব করিয়াছিলেন। সুতরাং মতিঝিলের গুরুত্ব নিতান্ত কম নহে। মতিঝিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে বিদায়-সম্ভাষণ জানাইয়াছে, আর ইংরেজ সেনাপতি ক্লাইভ্‌কে অভ্যর্থনা করিয়া লইয়াছে।

মতিঝিলের পূর্ব্বদিকে 'মবারক-মঞ্জিল'। ইহা নবাব বাহাদুরদিগের একটী বাগান বাড়ী। জর্জ্জ ফেণ্ডাল সাহেবের নাম অনুসারে ইহা 'ফেণ্ডাল্‌বাগ' নামেও অভিহিত হয়।

নবাব সিরাজউদ্দৌলা মতিঝিলের আদর্শে হীরাঝিল নামে আর একটী ঝিল ও বাগান-বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন।

ইহা জাফরগঞ্জের বিপরীত দিকে মন্‌সুরগঞ্জে অবস্থিত। কেহ কেহ ইহাকে মনসুরগঞ্জের প্রাসাদ বা লালকুঠি নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। সিরাজউদ্দৌলার উপাধি ছিল 'মন্‌সুর-উল্‌-মুল্‌ক'। এই উপাধি হইতে স্থানটীর নাম 'মন্‌সুরগঞ্জ' হইয়াছে। সিরাজউদ্দৌলা ইহাকে অতি যত্নে সজ্জিত করিয়া উৎসব-ভবনে পরিণত করিয়াছিলেন। কিন্তু আজ তাহার চিহ্ন প্রায় সম্পূর্ণভাবে মিলাইয়া গিয়াছে। ভাগীরথী নদী সিরাজ ও লুৎফউন্নিসার প্রিয়তম আবাস-বাটী হীরাঝিলের প্রাসাদটী প্রায় সম্পূর্ণভাবে লুপ্ত করিয়া ফেলিয়াছে।

ব্যবসায়ী-মহলে মুর্শিদাবাদের প্রধান গৌরব তাহার রেশমশিল্প ও হস্তিদন্তের বিবিধ দ্রব্য। অতি প্রাচীন যুগে ইংরেজ ও ফরাসী বণিক্‌গণ কাশিমবাজারে দোকান খুলিয়া বসিয়াছিলেন এবং সেখান হইতে মুর্শিদাবাদী রেশম ও হস্তি-দন্তের পণ্য প্রচুর পরিমাণে পাশ্চাত্য জগতে রপ্তানী করিতেন।

রেশম-শিল্প ও হস্তিদন্তের কারুশিল্পের জন্য মুর্শিদাবাদের প্রসিদ্ধি আজও রহিয়াছে। কিন্তু যাহা গিয়াছে, তাহা আর ফিরিয়া আসে নাই। মুর্শিদাবাদের রাজশক্তি বিলুপ্ত, তাহার সমৃদ্ধিও বিস্মৃত। একমাত্র সান্ত্বনা এই যে, প্রাচীন শাসক-বংশেরই একজন আজ মুর্শিদাবাদের নবাব বাহাদুর। রাজশক্তি তাঁহার না থাকিলেও, মুর্শিদাবাদের হিন্দু-মুসলমান বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী প্রজাদিগের হৃদয়ে তিনি স্বর্ণ-সিংহাসন অধিকার করিয়া আছেন।

ঢাকা

বাঙ্‌লার রাজধানী কলিকাতা, আর পূর্ব্ব-বাঙ্‌লার রাজধানী ঢাকা। কলিকাতা ভাগীরথী বা গঙ্গার তীরে, আর ঢাকা বুড়ীগঙ্গা নামক নদীর তীরে। সুতরাং উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য যথেষ্ট। কিন্তু অসামঞ্জস্যও অনেক আছে।

বাঙ্‌লার এই সর্ব্বপ্রধান নগরী দুইটির মধ্যে প্রধান অসামঞ্জস্য এই যে, প্রাচীন কলিকাতা ছিল আড়ম্বর আর ঐশ্বর্য্যহীন; তাহার বর্ত্তমান জীবন ঐশ্বর্য্য-সমুজ্জ্বল।

ঢাকার জীবনী তাহার সম্পূর্ণ বিপরীত। অতীতের ঢাকা নগরী ঐশ্বর্য্যের লীলা-নিকেতন ছিল, কিন্তু বর্ত্তমানে এই নগরী মলিন।

মোগল আমলের রাজধানী

আজ বাঙ্‌লার রাজধানী কলিকাতা; কিন্তু এককালে বাঙ্‌লার রাজধানী ছিল রাজমহল। তারপর একদিন তাহার পরিবর্ত্তন হইল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর তখন দিল্লীর অধীশ্বর। সুবাদার ইস্‌লাম খাঁ ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে রাজমহল হইতে ঢাকায় রাজধানী বদল করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের নাম অনুসারে ঢাকার নাম হইল 'জাহাঙ্গীর-নগর'।

সম্রাট্ শাহ্‌জাহান তাঁহার রাজত্বকালে পুত্র শাহ্ সুজাকে বাঙ্‌লার সুবাদার করিয়া পাঠাইলেন। সুবাদার শাহ্ সুজা বাঙ্‌লার রাজধানী পুনরায় রাজমহলে লইয়া গেলেন।

ইহার কিছুকাল পরে শাহ্ সুজার জীবনে পরিবর্ত্তন ঘটিয়া গেল। শাহ্‌জাহানের বার্দ্ধক্যে তাঁহার পুত্রগণের মধ্যে সিংহাসনের জন্য যুদ্ধ আরম্ভ হইল। শাহ্‌সুজা তাঁহার ভ্রাতা আওরংজেব কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া আরাকানে পলাইয়া গেলেন। বাঙ্‌লার সুবাদারী মস্‌নদ্ শূন্য পড়িয়া রহিল। বিজয়ী আওরংজেব তখন তাঁহার বিশ্বস্ত সেনাপতি মীর জুম্‌লাকে বাঙ্‌লার সুবাদার নিযুক্ত করিলেন। মীর জুম্‌লা রাজধানী পুনরায় ঢাকায় লইয়া গেলেন ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে।

মীর্‌ জুম্‌লার মৃত্যু হইলে সম্রাজ্ঞী মমতাজমহলের ভ্রাতা শায়েস্তা খাঁ বাঙ্‌লার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার শাসনকালে ঢাকা নগরীর গৌরবের অন্ত ছিল না।

আওরংজেবের পৌত্র আজিম উশ্‌শান যখন ঢাকায় সুবাদারী করিতেছিলেন, সেই সময়ে মুর্শিকুলী খাঁ নামে এক সুচতুর্‌ ব্যক্তি ছিলেন দেওয়ান। আজিম উশ্‌শানের সহিত তাঁহার সদ্ভাব না থাকায় তিনি তাঁহার দপ্তরখানা ঢাকা হইতে মুর্শিদাবাদে লইয়া যান। কালে আজিম উশ্‌শান হইলেন বিহারের সুবাদার, আর মুর্শিদকুলী খাঁ হইলেন বাঙ্‌লার সুবাদার। মুর্শিদকুলী খাঁ সুবাদার হইয়াও তাঁহার রাজধানী মুর্শিদাবাদেই রাখিলেন। সুতরাং সেইদিন হইতে ঢাকা তাহার পূর্ব্ব গৌরব হারাইতে আরম্ভ করিল।

ঢাকার শাসক 'নায়েব-নাজিম'

মুর্শিদকুলী খাঁর রাজধানী পরিবর্ত্তনের পর হইতে নবাবের প্রতিনিধি বা 'নায়েব-নাজিম'গণ ঢাকার শাসনকার্য্য চালাইতে লাগিলেন। পলাশীর যুদ্ধক্ষেত্রে ইংরেজের ভাগ্যদেবতা সুপ্রসন্ন হইলেন, এবং ধীরে ধীরে বাঙ্‌লার শাসনভার ইংরেজদের হস্তগত হইল। ক্রমশঃ ঢাকার নায়েব-নাজিম-গণের ক্ষমতা কমিতে লাগিল। অবশেষে নায়েব-নাজিমের পদ একেবারেই তুলিয়া দেওয়া হইল।

ঢাকার পুরাতন নাম

কেহ কেহ মনে করেন, সম্রাট্‌ জাহাঙ্গীরের নাম হইতে

ঢাকার 'জাহাঙ্গীর-নগর' নামের উৎপত্তি, সুতরাং তাঁহার পূর্ব্বে বোধ হয় ঢাকার কোন খ্যাতি ছিল না। কিন্তু এই অনুমান নিতান্ত ভ্রান্ত।

ঢাকা অতি সূক্ষ্ম 'মস্‌লিন' কাপড়ের জন্য বহুকাল যাবৎ বিখ্যাত ছিল। তাহার সেই গর্ব্বের জিনিস প্রচুর পরিমাণে গ্রীস প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশে অতি প্রাচীনকালেও রপ্তানী হইত।

ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণায় কাপাসিয়া নামে একটি জায়গা আছে। সেই কাপাসিয়া নগর মস্‌লিনের জন্মস্থান। মস্‌লিনের উৎপত্তি স্থান বলিয়া ঢাকা গ্রীকদিগের নিকটে 'কাবসিয়াম্‌' নামে পরিচিত ছিল। ইহা যীশুখ্রীষ্ট জন্মিবার দুইশত বৎসর পূর্ব্বেকার কথা।

কোনও কোনও পাশ্চাত্য জাতি ঢাকার নাম দিয়াছিল 'গ্যাঞ্জেটিকা'। ধলেশ্বরী ও পদ্মানদী সেই যুগে 'গঙ্গা' বা 'গ্যাঞ্জেস্‌' নামে পরিচিত ছিল। তাহা হইতে ঢাকার নাম হইয়াছিল 'গ্যাঞ্জেটিকা'।

ধলেশ্বরী ও পদ্মা নদীর তীরবর্ত্তী স্থানসমূহে এক সময় বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রাধান্য ছিল খুব বেশী। কিন্তু ব্রাহ্মণগণ বৌদ্ধ-দিগকে অতি ঘৃণার চোখে দেখিতেন। সেইজন্য বৌদ্ধ দেশের নদীগুলিকে তাঁহারা আর 'গঙ্গা' বলিতে রাজি হইলেন না; তাহাদের নাম হইল ধলেশ্বরী ও পদ্মা।

নামটি 'ঢাকা' হইল কেন, সে বিষয়ে কয়েকটি জনশ্রুতি

প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ঢাকেশ্বরী দেবীর মূর্ত্তি অনেক দিন এখানে 'ঢাকা' বা গুপ্ত ছিল। পরে মহারাজ বল্লাল সেন উহা আবিষ্কার করিয়া মন্দির মধ্যে স্থাপন করেন। কেহ কেহ বলেন, দক্ষ যজ্ঞের সময় পতি-নিন্দায় ক্ষুব্ধ হইয়া সতী দেহ-ত্যাগ করিলে, মহাদেব তাঁহার মৃতদেহ স্কন্ধে লইয়া সারা পৃথিবী ঘুরিয়া বেড়ান। সেই সময়ে সতীর অলঙ্কার ও গলিত দেহ খণ্ড-বিখণ্ড হইয়া নানা জায়গায় পড়িয়াছিল। তাঁহার মুকুটের 'ডাক' পড়িয়াছিল এইখানে। জড়োয়া গহনার সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য গহনার নীচে 'ডাক' বসানো হয়। 'ডাক' পড়িয়াছিল বলিয়া এই জায়গায় নাম হইয়াছে 'ঢাকা' এবং স্থানটী পীঠস্থান না হইলেও একটী উপপীঠ রূপে পরিগণিত হইয়া আসিতেছে।

ঢাকার প্রাচীন নাম যাহাই হউক না কেন এবং কতদিন হইতে ইহার প্রসিদ্ধি সে বিষয়ে যতই মতভেদ থাকুক না কেন, তাহাতে বিশেষ কিছু আসে যায় না। মোটামুটি এইটুকু পরিষ্কার বুঝা যায় যে ঢাকা অতি পুরাতন শহর।

পুরাতন স্থানের প্রাচীন স্মৃতিগুলি একেবারে বিলুপ্ত হইয়া যায় না; ঢাকারও প্রাচীন স্মৃতি এখনও কিছু কিছু রহিয়া গিয়াছে। ঢাকা শহর এবং ঢাকা জেলার নানাস্থানে ঢাকার প্রাচীন গৌরব ও সমৃদ্ধির স্মৃতিচিহ্নগুলি এখনও সকলের মন বিস্ময়ে ভরিয়া দেয়।

বড় কাট্‌রা ও ছোট কাট্‌রা ঢাকার দুইটি পুরাতন সৌধ। সুবাদার শাহ্ সুজা এই বড় কাট্‌রা নামক সরাইখানা নির্ম্মাণ

করাইয়াছিলেন। ছোট কাট্‌রাও একটি সরাইখানা ছিল। ইহার নির্ম্মাতা সুবাদার শায়েস্তা খাঁ। ছোট কাট্‌রার নিকটবর্ত্তী স্থান 'চাঁপাতলা' নামে পরিচিত। ইহারও একটা কারণ অনুমান করা যায়। ছোট কাট্‌রার মধ্যে একটী কবর আছে। তাহা বিবি চম্পার কবর। সম্ভবতঃ তাহা হইতেই সেই অঞ্চলের নাম 'চাঁপাতলা' হইয়া থাকিবে। কিন্তু যাঁহার নাম অনুসারে 'চাঁপাতলা' নামের উৎপত্তি, সেই চম্পা বিবির কোনও পরিচয়ই জানা যায় নাই।

বুড়ীগঙ্গা নদীর অপর তীরে 'জিঞ্জিরা' নামক গ্রামে এখনও একটি প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। সুবাদার ইব্রাহিম খাঁ সেই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। নবাব সিরজউদ্দৌলার ভাগ্য অস্তমিত হইলে এই প্রাসাদেই তাঁহার মাতা, মাসীমাতা বেগম লুৎফ-উন্নিসা ও তাঁহার শিশু-কন্যাটি আবদ্ধ ছিলেন। তারপর মুর্শিদাবাদে লইয়া যাইবার ছলে মীরণ তাঁহাদিগকে জলে ডুবাইয়া হত্যা করেন।

ঢাকা শহরে ও ঢাকার আশে পাশে মস্‌জিদের অভাব নাই। চকবাজারের বড় মস্‌জিদটি সায়েস্তা খাঁ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। ঢাকার সর্ব্বাপেক্ষা বড় মস্‌জিদ্ বেগমবাজারে অবস্থিত—নবাব মুর্শিদকুলী খাঁ ইহার নির্ম্মাতা।

ঢাকার প্রাচীন কীর্ত্তিগুলির মধ্যে লালবাগের কেল্লা একটি প্রধান দর্শনীয় জিনিস। সম্রাট্ আওরংজেবের পুত্র মহম্মদ আজম একসময় বাঙ্‌লার সুবাদার ছিলেন। লালবাগের কেল্লা

তাঁহারই নির্ম্মিত বিরাট কীর্ত্তি। এখন ইহা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত। তথাপি ইহার সুদৃঢ় উচ্চ প্রাচীর এবং উন্নত স্তম্ভ এখনও ইহার বিশালত্বের সাক্ষ্য দিতেছে।
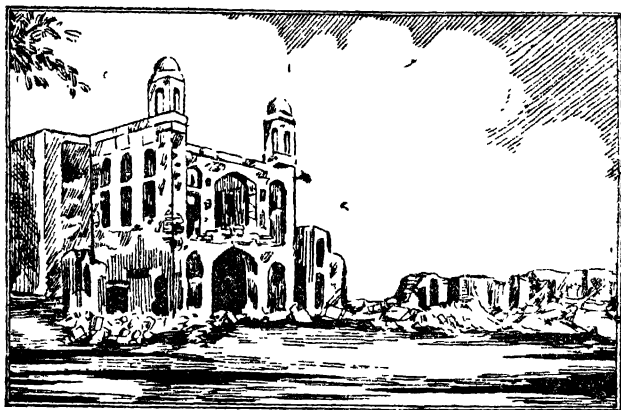
লালবাগের কেল্লা

লালবাগ কেল্লার নিকটেই লালবাগ মস্‌জিদ্। সম্রাট্ আওরংজেবের প্রপৌত্র সম্রাট্ ফরুখ্‌শিয়র যখন ঢাকায় ছিলেন সেই সময় এই মস্‌জিদ্‌টি তিনি নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। সম্রাট্ ফরুখ্‌শিয়র, আজিম উশ্‌শানের পুত্র। আজিম উশ্‌শান্‌ও বাঙ্লার সুবাদার ছিলেন। তিনিও বুড়ীগঙ্গা নদীর তীরে একটী প্রাসাদ নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। তাহার নাম পোস্তা প্রাসাদ। প্রাসাদটী সম্প্রতি নদীগর্ভে বিলীন হইয়া গিয়াছে।

ঢাকার আর একটী প্রাচীন কীৰ্ত্তি হুসেনী দালান। ইহা ঢাকার উত্তর দিকে অবস্থিত। সুবাদার শাহ্ সুজার নৌ-বাহিনীর অধ্যক্ষ সৈয়দ মীর মুরাদ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে এই ইমাম্‌বাড়া নিৰ্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। মহরমের সময়ে এখানে উৎসবের ধূম পড়িয়া যায়।
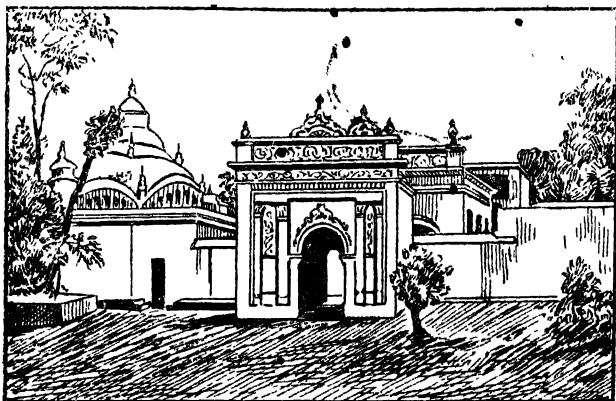
ঢাকেশ্বরী মন্দির

ঢাকার ঢাকেশ্বরী মন্দির হিন্দুদের পবিত্র তীর্থ। কেহ কেহ বলেন, মহারাজ বল্লাল সেন এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভিন্ন জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যায়। নিম্নে তাহা লিখিত হইল।

বাঙ্‌লাদেশের বিখ্যাত বারোজন ভূস্বামী তাঁহাদের শৌর্য্যবীর্য্যের জন্য আজও 'বারো ভূঁইয়া' নামে বিখ্যাত।

কেদার রায় তাঁহাদের অন্যতম। পদ্মার তীরে শ্রীপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। সেকালে শ্রীপুর একটি উৎকৃষ্ট পোতাশ্রয় বলিয়াও গণ্য হইত। কেদার রায় নৌ-বলে বলীয়ান্ হইয়া সন্দীপ অধিকার করিয়া লইয়াছিলেন। তখনকার মোগল সম্রাট্‌কে পর্য্যন্ত তিনি গ্রাহ্য করিতেন না।

তাঁহাকে দমন করিবার জন্য মোগল সেনাপতি মহারাজ মানসিংহের অধীনে এক বিশাল সৈন্য-বাহিনী প্রেরিত হইল। যুদ্ধে কেদার রায় নিহত হইলেন। তারপর মহারাজ মানসিংহ কেদার রায়ের গৃহদেবী 'শিলাময়ী'কে ঢাকায় লইয়া আসিলেন। তিনি শিলাময়ীর আদর্শে আর একটি মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া 'ঢাকেশ্বরী' নামে ঢাকায় তাহার প্রতিষ্ঠা করিলেন এবং আসল শিলাময়ীকে জয়পুরে লইয়া গেলেন। এখনও সেই বিগ্রহটী জয়পুরে 'সল্লাদেবী' নামে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। যাহা হউক, এই দ্বিতীয় মত অনুসারে ঢাকেশ্বরী দেবীর প্রতিষ্ঠাতা মহারাজ মানসিংহ।

সিদ্ধেশ্বরী মন্দির

চাঁদ রায় নামক অপর এক ভূস্বামী বারো ভূঁইয়ার অন্যতম। তিনি কেদার রায়ের পিতা অথবা কেদার রায়ের ভ্রাতা তাহা সঠিক জানা যায় না। শোনা যায়, ঢাকা শহরের উত্তরে মালীবাগে যে সিদ্ধেশ্বরী মন্দির আছে তাহা চাঁদ রায়ের প্রতিষ্ঠিত।

সৌমার বন গোস্বামী নামে একজন ভক্ত ও সিদ্ধপুরুষ দেবী সিদ্ধেশ্বরীর পূজারী ছিলেন। কথিত আছে, তাঁহার খ্যাতি শুনিয়া ঢাকা শহরের আজিমপুর মহল্লা হইতে শাহ. আলি সাহেব নামক অপর একজন সাধক বাঘের পিঠে চড়িয়া তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসেন। সৌমার বন গোস্বামী তাঁহার গর্ব্ব চূর্ণ করিবার জন্য এক অভিনব উপায় উদ্ভাবন করিলেন। তিনি এক প্রাচীরে আরোহণ করিলেন, তারপর সেই সমগ্র প্রাচীরসহ আলি সাহেবকে অভ্যর্থনা করিতে অগ্রসর হইলেন। একটা নির্জ্জীব ও জড় প্রাচীরকে সওয়ার লইয়া অগ্রসর হইতে দেখিয়া শাহ আলি সাহেব আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। তাঁহার অহঙ্কার চূর্ণ হইল।

রমণার বুড়া শিব ও রমণার কালী ও নবাবপুরের লক্ষ্মী-নারায়ণ

ঢাকা শহরের উত্তর দিকে সুবিস্তৃত রমণার মাঠ। এই রমণার মাঠেও দুইটি দর্শনীয় মন্দির আছে। তাহাদের একটিতে বুড়া শিব ও অপরটিতে রমণার কালী স্থাপিত আছেন। কেহ কেহ বলেন, বুড়া শিব শঙ্করাচার্য্য কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত। ইহা সত্য হইলে বুড়া শিব প্রকৃতই বুড়া হইয়াছেন, তাঁহার বয়স হইবে এক হাজার বৎসরের বেশী।

রমণার কালী সম্পর্কেও একটা জনশ্রুতি শুনিতে পাওয়া যায়। শুনা যায়, ব্রহ্মানন্দ গিরি নামে একজন সিদ্ধ-পুরুষ সিদ্ধিলাভ করিবার পূর্ব্বে অতি দুর্ব্বৃত্ত ও অসচ্চরিত্র ছিলেন।

একদিন খুব একটী গর্হিত কাজ করিয়া তিনি বিষম অনুতপ্ত হন এবং সেজন্য দেবতাকেই দায়ী করেন। তিনি স্থির করিলেন, দেবীর সাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়া তিনি তাঁহাকে শাস্তি দিবেন। সুতরাং তিনি অতি কঠোর সাধনা আরম্ভ করিলেন। কালক্রমে তিনি সিদ্ধিলাভ করিলেন, দেবী তাঁহার নিকট হইতে শাস্তি গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন। স্থির হইল, যে প্রস্তরখণ্ডের উপরে বসিয়া ব্রহ্মানন্দ গিরি সাধনা করিতেন সেই বিশাল প্রস্তরটী বহন করিয়া দেবী তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে চলিবেন; কিন্তু ব্রহ্মানন্দ গিরি দেবীকে অবহেলা করামাত্র দেবী তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবেন। দেবী দীর্ঘকাল ব্রহ্মানন্দ গিরির পিছনে সেই প্রস্তরখণ্ড বহিয়া চলিলেন। কিন্তু রমণার মাঠে আসিলে ব্রহ্মানন্দ গিরি দেবীর প্রতি অবহেলার ভাব দেখাইলেন। ইহাতে দেবী তৎক্ষণাৎ সেই প্রস্তর-খণ্ড সেখানে ফেলিয়া অদৃশ্য হইয়া গেলেন। রমণার কালী-মন্দিরের আঙ্গিনায় সেই প্রস্তর-খণ্ড আজও দেখিতে পাওয়া যায়। উহা 'ব্রহ্মানন্দ গিরির সিদ্ধাসন' নামে পরিচিত।

ঢাকা শহরে নবাবপুরের লক্ষ্মী-নারায়ণ বিগ্রহ আর একটি প্রাচীন দেবমূর্ত্তি। ঢাকার কাপড় ব্যবসায়ী বসাকদিগের পূর্ব্ব-পুরুষ ছিলেন কৃষ্ণদাস মুৎসুদ্দি। তিনি এই বিগ্রহটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে প্রতিষ্ঠিত করেন।

আধুনিক কীর্ত্তি

ঢাকার বর্ত্তমান গৌরব ঢাকার নবাবের প্রাসাদ আহ্‌সান-

মঞ্জিল। ইংরেজ আমলের আগে এই জায়গায় ফরাসীদিগের একটি বাণিজ্য-কুঠি ছিল। তাহা এখন আহ্‌সান-মঞ্জিলের অন্তর্ভুক্ত হইয়া গিয়াছে।

মুর্শিদাবাদের নবাব অথবা শাসক শ্রেণীর অপর কোনও নবাব-বংশের সহিত ঢাকার নবাব-বংশের কোনও সম্পর্ক নাই। ইঁহাদের পূর্ব্বপুরুষ ব্যবসায়ের নিমিত্ত এখানে আসিয়াছিলেন। কালে ব্যবসায়ে অসাধারণ উন্নতি করিয়া ইঁহারা বিপুল ভূ-সম্পত্তি ক্রয় করেন। তাহা হইতেই ঢাকার নবাব-বংশের উৎপত্তি।

প্রাচীন যুগে ঢাকার বাণিজ্য অতিশয় সমৃদ্ধ ছিল। পাশ্চাত্য জাতিদিগের অনেকেরই বাণিজ্য-কুঠি এইখানে ছিল। পূর্ব্বে যেখানে ওলন্দাজদিগের কুঠি ছিল, এখন সেখানে মিট্‌ফোর্ড হাসপাতাল নির্ম্মিত হইয়াছে। আর ইংরেজ-বণিক্‌দের কুঠি যেখানে ছিল, এখন সেখানে ঢাকা কলেজিয়েট্‌ স্কুল অবস্থিত।

ঢাকা ষ্টেশনের নিকটে সুবিস্তৃত রমণার ময়দানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুদৃশ্য সৌধমালা। মাত্র কয়েক বৎসরের মধ্যে এখানে এক নূতন শহর গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহার ঘন-বৃক্ষ শোভিত রাজপথগুলি দূর হইতে একখানি চিত্রের মত দেখায়।

লাট সাহেবের প্রাসাদ, ইণ্টারমিডিয়েট্‌ কলেজ, বিশ্ব-বিদ্যালয়, মুসলিম হল, ঢাকা হল, জগন্নাথ হল, ইঞ্জিনীয়ারিং

স্কুল প্রভৃতি সুদৃশ্য সৌধমালা এবং শ্যামল তৃণাচ্ছাদিত রমণার প্রান্তর—ঢাকার বুকে যেন এক সোনার ছবি আঁকিয়া দিয়াছে!
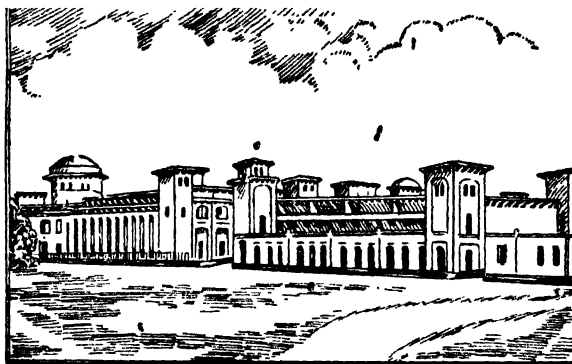
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

রমণার ঘোড়দৌড়ের মাঠের ধারে একটি ছোট ঝিল আছে। সেখানকার দৃশ্যও চমৎকার।

ঢাকার শিল্প

অতীতের গৌরবময় যুগে ঢাকার বস্ত্রশিল্প পৃথিবী-বিখ্যাত ছিল। সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের সময়ে ঢাকার একখানি 'মস্‌লিন' প্রায় ছয় হাজার টাকায় বিক্রয় হয়। ঢাকাই 'মস্‌লিন' এখন লুপ্তপ্রায়; কিন্তু ঢাকাই শাড়ী এখনও ঢাকার একটি প্রধান ব্যবসায়। ইহা ভিন্ন শঙ্খশিল্প ঢাকার একটি গর্ব্বের জিনিস।

বিক্রমপুর ঃ রামপাল ঃ সোনার গাঁও

ঢাকার কথা বলিতে গেলে ঢাকার বিক্রমপুর পরগণার

কথা অবহেলা করা যায় না। এই পরগণার উত্তরাংশ এখন ঢাকা জেলার মুন্সীগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত, দক্ষিণাংশ ফরিদপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত। বিশাল পদ্মা নদী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিক্রমপুরকে দ্বিখণ্ডিত করিয়াছে।

কথিত আছে, অতি প্রাচীনকালে 'বিক্রম' নামে একজন রাজা এই পরগণায় রাজত্ব করিতেন। তাঁহার নাম হইতেই সমস্ত পরগণার নাম হইয়াছে বিক্রমপুর।

বিক্রমপুর একদিন পূর্ব্ব-বঙ্গের শিক্ষার প্রধান কেন্দ্র ছিল। সংস্কৃত ও জ্যোতিষশাস্ত্র আলোচনার জন্য বহু দূর-দেশ হইতেও এখানে লোকসমাগম হইত। বিক্রমপুরের অধিবাসিগণ আজও শিক্ষাচর্চ্চায় উন্নত।

মুন্সীগঞ্জের নিকটে রামপাল নামে একটী গ্রাম আছে। এখানে সেনবংশীয় রাজাদের প্রধান রাজধানী ছিল। মাটি খুঁড়িয়া রামপালে ও তাহার কাছাকাছি কয়েক জায়গায় অনেক প্রাচীন ঐতিহাসিক স্মৃতিচিহ্নের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। 'বল্লাল বাড়ী' নামে মহারাজ বল্লাল সেনের একটী বৃহৎ প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ এখানে আবিষ্কৃত হইয়াছে। রামপাল দীঘি, বল্লাল দীঘি প্রভৃতিও রামপালের প্রাচীন গৌরবের সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। কেহ কেহ বলেন, প্রাচীন নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যক্ষ জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ শীলভদ্র এই রামপালেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

মুসলমান যুগে এই রামপালের অবনতি আরম্ভ হয়,

আর সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁয়ের উন্নতি হইতে থাকে। ঢাকার অদূরে নারায়ণগঞ্জ শহরের আট মাইল পূর্ব্বদিকে পানাম নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী আজ জঙ্গলে পরিপূর্ণ। কিন্তু এককালে ইহাই ছিল বাঙলার প্রসিদ্ধ নগরী সুবর্ণগ্রাম বা সোনার গাঁও। এই অঞ্চলে গড়, প্রাসাদ ইত্যাদি প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ এখনও বহু পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

রামপালের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণে বজ্রযোগিনী গ্রাম। গ্রামটী প্রকাণ্ড এবং অনেকগুলি পাড়ায় বিভক্ত। সোনার বাঙলার উজ্জ্বল যুগে বজ্রযোগিনীও নিতান্ত নগণ্য ছিল না। প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান অতীশ এই গ্রামেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি বৌদ্ধ-জগতে অতুলনীয় ছিল। দীপঙ্করের গৃহখানি বজ্রযোগিনী গ্রামে 'নাস্তিক পণ্ডিতের ভিটা' নামে পরিচিত হইয়া আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

এই সব অতীত কীর্ত্তি-কাহিনীর জন্য ঢাকা জেলার বিক্রমপুর পরগণাও ইতিহাসে উল্লেখযোগ্য। বিক্রমপুরের চারিদিক প্রধানতঃ এইভাবে বর্ণনা করা যাইতে পারে। ইহার উত্তরে ধলেশ্বরী নদী, দক্ষিণে ইদিলপুর পরগণা, পূর্ব্বে মেঘনা ও পশ্চিমে কীর্ত্তিনাশা বা পদ্মা। পদ্মার এই অংশ অত্যন্ত খরস্রোতা। পদ্মা তাহার তাণ্ডবলীলায় বহু প্রাচীন কীর্ত্তি ধ্বংস করিয়া 'কীর্ত্তিনাশা' নাম পাইয়াছে। সোনার বাঙলার যে সকল প্রাচীন কীর্ত্তি পদ্মা-গর্ভে তলাইয়া গিয়াছে, রাজা রাজ-

বল্লভের কীর্ত্তি তাহার মধ্যে প্রধান। রাজা রাজবল্লভ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমলে ঢাকার নায়েব-দেওয়ান ছিলেন। পদ্মার তীরে রাজনগরে তাঁহার বাস ছিল। বর্ত্তমান বহর বা রাজবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেশনের বিপরীত দিকে পদ্মার অন্য তীরে ছিল রাজনগর। রাজা রাজবল্লভ প্রচুর ঐশ্বর্য্যশালী ছিলেন। তিনি সেখানে একুশটী চূড়াবিশিষ্ট এক বিরাট মঠ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। দুরন্ত পদ্মা তাহা আপন গর্ভে টানিয়া লইয়াছে।

বহর ষ্টেশনের নিকটে রাজবাড়ী নামক স্থানে কেদার রায়েরও এইরূপ একটী কীর্ত্তি বর্ত্তমান ছিল। তিনি মায়ের চিতার উপর একটী মঠ তৈয়ারী করিয়াছিলেন। পদ্মাবক্ষে ষ্টীমার যাইবার সময়ে বহুদূর হইতে এই মঠের চূড়া যাত্রীগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিত। কিন্তু কয়েক বৎসর পূর্ব্বে পদ্মা ইহাকেও ভাঙ্গিয়া ফেলিয়াছে। পদ্মার এই সব ধ্বংস কার্য্যের জন্য তাহার কীর্ত্তিনাশা নাম যথার্থই সার্থক হইয়া উঠিয়াছে।
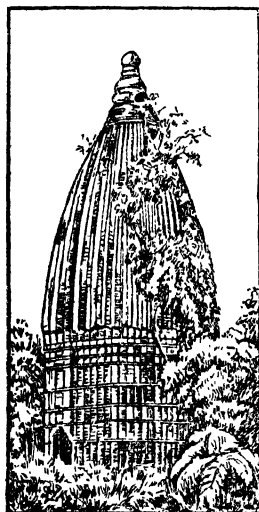
রাজবাড়ীর মঠ

ধলেশ্বরীর তীরে

ঢাকা জেলার অন্যতম নদী ধলেশ্বরীর তীরেও একদিন সোনার বাঙ্‌লার যে সোনার ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছিল আজও তাহা সম্পূর্ণভাবে বিলীন হইয়া যায় নাই।

ধলেশ্বরীর তীরে একটী বিখ্যাত বাণিজ্য-বন্দর—সাভার। কথিত আছে, পূর্ব্বে এখানে 'সম্ভার' বা 'সম্ভাগ' নামে একটী রাজ্য ছিল। পরবর্ত্তী কালে তাহা 'সর্ব্বেশ্বর নগরী' নামে খ্যাতি লাভ করে। সাভারের পূর্ব্বদিকে 'বলীমোহর' নামক জায়গায় এখনও কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট প্রাসাদ দেখা যায়। কেহ কেহ বলেন, রাজা হরিশ্চন্দ্র পাল নামে এক রাজা মেদিনীপুর অঞ্চল হইতে এখানে আসিয়া এই রাজ্য স্থাপন করেন। তাঁহারই প্রাসাদের ধ্বংসাবশেষ বলীমোহরে দেখিতে পাওয়া যায়। রাজা হরিশ্চন্দ্রের তুই মহিষী ছিলেন—'কণাবতী' ও 'ফুলেশ্বরী'। সাভারের নিকটবর্ত্তী 'কণপড়া' ও 'ফুলবাড়িয়া' নামক তুইখানি গ্রাম তাঁহাদেরই স্মৃতি সজীব রাখিয়াছে।

ভারত-ইতিহাসের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ চরিত্র রাজা অশোক—একথা অস্বীকার করা চলে না। তাঁহার ধর্ম্ম-প্রীতি ও বৌদ্ধ মনোভাব সাভারের অদূরবর্ত্তী ধামরাই গ্রামে আজও বর্ত্তমান রহিয়াছে। 'ধামরাই'-এর পূর্ব্ব-নাম ছিল 'ধর্ম্মরাজিয়া'। সম্রাট্ অশোক ধর্ম্মপ্রচারের নিমিত্ত ৮৪ হাজার 'ধর্ম্মরাজিকা-স্তম্ভ' স্থাপিত করিয়াছিলেন। একটী 'ধর্ম্মরাজিকা-স্তম্ভ' এই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত

ছিল, এবং তাহা হইতেই গ্রামের নাম হইয়াছিল 'ধর্ম্মরাজিয়া' —এই অনুমান একেবারে অসম্ভব নহে।

ধামরাই গ্রাম ইহার বাণিজ্য এবং যশোমাধব ও আদ্যা-শক্তি ইত্যাদি দেব-বিগ্রহের জন্য বিখ্যাত। কথিত আছে, রাজা যশোপাল একবার হস্তিপৃষ্ঠে এই অঞ্চলে আগমন করেন। কিন্তু এক উচ্চ টিবির সম্মুখে আসিয়া হস্তী নিশ্চল হইয়া গেল, সে আর কিছুতেই অগ্রসর হইতে পারিল না। রাজা কৌতূহলী হইয়া স্থানটী খনন করিবার আদেশ দিলেন। মাটীর নিম্ন হইতে মাধবের মূর্ত্তি ও একটী মন্দির বাহির হইল। রাজা যশোপালের নাম হইতে দেবতার নাম হইল 'যশোমাধব'। কেহ কেহ বলেন, পুরীর জগন্নাথদেবের মূর্ত্তি নির্ম্মাণের পরে যে কাঠ অবশিষ্ট ছিল, তাহা দিয়া যশো-মাধবের মূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছিল। প্রতি বৎসর রথের সময় এখানে বিপুল উৎসবের ধূম পড়িয়া যায়।

সুদূর অতীত কালে ঢাকা নগরী ও ঢাকা জেলার অন্তর্গত স্থানসমূহে প্রকৃতই সোনার ফুল ফুটিয়া উঠিয়াছিল। ঢাকা শহরের এখানে-সেখানে মন্দির, মস্‌জিদ্, দুর্গ, প্রাসাদ এবং ঢাকা জেলার সর্ব্বত্র গড়, পরিখা, হর্ম্ম্যরাজি, বৌদ্ধ চৈত্য ও ধর্ম্মরাজিকা স্তম্ভ ইত্যাদি আজ যদি যাদুমন্ত্রে সহসা প্রাণ পাইয়া জাগিয়া উঠে তবে 'সোনার বাঙ্‌লা'র স্বর্ণচ্ছটা আবার ঝল্‌কিয়া উঠিবে। ঐ সব প্রাচীন কীর্ত্তি আজ জীর্ণ ও ধ্বংসাবশিষ্ট হইলেও দগ্ধ সোনার মত সেগুলি অমূল্য সামগ্রী!

দার্জ্জিলিং

'শৈল-নিবাসের রাণী'

দার্জ্জিলিং সৌন্দর্য্যের মায়াপুরী। অনুপম প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের জন্য ইহা সমগ্র ভারতে "শৈল-নিবাসের রাণী" বলিয়া বিখ্যাত। স্থানটির স্বাস্থ্যকর জল-বায়ু আর অতুলন সৌন্দর্য্যের জন্য বাঙ্‌লার লাটসাহেব ইহাকেই তাঁহার গ্রীষ্মাবাস নির্ব্বাচন করিয়া লইয়াছেন। সুতরাং গ্রীষ্মকালে দার্জ্জিলিং বাঙ্‌লার রাজধানীতে পরিণত হয়।

নামের উৎপত্তি

কথিত আছে, পূর্ব্বে এই জায়গায় 'দুর্জ্জয়লিঙ্গ' মহাদেবের একটি মন্দির ছিল। সেই দুর্জ্জয়লিঙ্গের নাম হইতে জায়গাটার নাম 'দার্জ্জিলিং' হইয়াছে। দার্জ্জিলিং শহরের বর্ত্তমান 'অবজার্ভেটরী' পাহাড়ের উপর দুর্জ্জয়লিঙ্গের মন্দির ছিল, প্রাচীনেরা এখনও সেকথা বলিয়া থাকেন।

দার্জ্জিলিং নাম কি করিয়া হইল সে সম্বন্ধে অন্যরকম জনশ্রুতিও শুনিতে পাওয়া যায়। দার্জ্জিলিং জেলার পূর্ব্ব নাম নাকি ছিল 'মোরঙ্'। ক্রমে তিব্বতীয় বৌদ্ধদের একটি মঠ এখানে প্রতিষ্ঠিত হয়। সেই মঠকে বলা হইত 'দোর্জ্জে'। 'দোর্জ্জে' হইতে 'দার্জ্জিলিং' নামের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। এই উভয় জনশ্রুতির কোনটাই অস্বাভাবিক বা অসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না।

দার্জ্জিলিংএর পথে

দার্জ্জিলিং প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলা-নিকেতন। সৌন্দর্য্যের সেই লীলা-কুঞ্জে যাইবার সমগ্র পথও কে যেন প্রাকৃতিক শোভায় মনোরম করিয়া রাখিয়াছে! পূর্ব্ববঙ্গ রেলপথের প্রান্তবর্ত্তী শিলিগুড়ি ষ্টেশনের পর হইতেই প্রকৃতির অপরূপ শোভায় মুগ্ধ হইতে হয়। শিলিগুড়ির পর হইতে দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথ আরম্ভ হইয়া দার্জ্জিলিং পর্য্যন্ত পৌঁছিয়াছে। দার্জ্জিলিং যাইতে হইলে শিলিগুড়ি ষ্টেশনে অবতরণ করিয়া পুনরায় অন্য গাড়ীতে আরোহণ করিতে হয়।

এই দার্জ্জিলিং-হিমালয় রেলপথের গাড়ীগুলির কিছু বিশিষ্টতা আছে। এখানকার রেলপথটি মাত্র দুই ফুট চওড়া। দুই ফুট চওড়া রেলপথে আর কত বড় গাড়ী চলিতে পারে? সুতরাং শিলিগুড়ির পর হইতে যে সব রেলগাড়ী চোখে পড়ে সেগুলিকে একরকম খেলাঘরের গাড়ী বলিয়াই মনে হয়!

তরাই

রেলপথের দুই ধারে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর নিম্নভূমি 'তরাই'। 'তরাই'-এর বুকে দিগন্ত-বিস্তৃত চা-বাগান ও ঘন জঙ্গল। উঁচু-নীচু ক্ষেত্রে উৎপন্ন হওয়ায় সেই শ্যামল বনরাজি দেখিয়া মনে হয়, যেন কোন্ বনদেবী তাঁহার কুঞ্চিত কেশরাজি এলাইয়া দিয়াছেন!

পার্ব্বত্য রেলপথ

শিলিগুড়ি হইতে সাত মাইল দূরে সুক্‌না ষ্টেশন। সে পর্য্যন্ত রেলপথের দুই দিকে জঙ্গলময় সমতল পথ। কিন্তু সুক্‌নার পর হইতেই পাহাড়ের 'চড়াই' বা খাড়াপথ। তখন রেলপথ হিমালয়ের অন্তর্গত 'সিঙ্গলীলা' পর্ব্বতমালার একটি শাখার উপর দিয়া চলিয়া গিয়াছে। তাহার একদিকে নেপাল, আর অন্যদিকে সিকিম ও দার্জ্জিলিং।

সুক্‌নার পর হইতেই প্রকৃতি দেবী যেন ক্রমশঃ অপরূপ সাজে দেখা দিতে থাকেন। রেলপথের দুই পাশে শ্যামল বনানী, তাহাতে রং-বেরঙের ফুল, সেই সঙ্গে নানারকম

বনবিহঙ্গের মিলিত কূজন আগন্তুক মাত্রকেই মুগ্ধ করিয়া দেয়।

পার্ব্বত্য রেলপথ

গাড়ী রংটং পৌঁছিবার পূর্ব্বেই গাড়ীর গতিপথ বক্কিম হইয়া যায় ;—ঠিক সোজা খাড়াপথে অগ্রসর হইতে না পারিয়া গাড়ী তখন চক্রাকারে ঘুরিয়া ঘুরিয়া উপরে উঠিতে থাকে। এই প্রথম চক্রটি '১নং লুপ্' নামে পরিচিত। দার্জ্জিলিং-গামী গাড়ীকে এইভাবে আরও তিনটি 'লুপ্' অতিক্রম করিতে হয়। এই সকল 'লুপ্' অতিক্রম করিবার সময়ে গাড়ী যে ভাবে চলে তাহা দেখিবার মত। ইঞ্জিনশুদ্ধ গাড়ীখানি তখন একবার পাহাড়ের গা বাহিয়া নীচের দিকে নামিতে থাকে, আবার

পরমুহূর্ত্তে উচ্চতর পথ ধরিয়া উপরের দিকে অগ্রসর হয়।

দার্জ্জিলিং যাইবার পথে পাহাড়ের উপর 'পাগলা ঝোরা' নামে একটি স্রোতঃস্বতী চোখে পড়ে। পূর্ব্বে ইহার প্রচণ্ড শব্দে বহুদূরের বনপথও প্রতিধ্বনিত হইত এবং শ্রোতার হৃদয়ে ইহা ত্রাসের সঞ্চার করিত। কেবল তাহাই নহে, প্রতি বৎসর বর্ষাকালে ইহার উন্মত্ত জলধারায় রেলপথ ধ্বসিয়া যাইত। ইহাতে রেল কোম্পানি প্রভূত ক্ষতিগ্রস্ত হইত। বিপুল ক্ষতি সহ্য করিবার পরে অবশেষে পাগলা ঝোরাকে আয়ত্ত করা সম্ভবপর হইয়াছে। ইহার জলধারাকে তুই তিনভাগে বিভক্ত করিয়া স্রোতের প্রখরতা অনেকখানি সংযত করা হইয়াছে,—পাগ্লা ঝোরা এখন শৃঙ্খলিত হইয়াছে।

বাঙ্লাদেশের অমর কবি সত্যেন্দ্রনাথ পাগ্লা ঝোরার স্বাধীন উদ্দাম গতির এই তুর্দ্দশা উপলব্ধি করিয়াছিলেন। তাঁহার রচিত একটি কবিতায় পাগলা ঝোরার বিলাপ-সঙ্গীত ভাষা পাইয়াছে। পাগলা ঝোরার সে বিলাপ বড়ই করুণ!

"তোমরা কেউ শুন্বে নাগো পাগ্লা ঝোরার তুঃখ-গাথা,
পাগ্লা ব'লে কর্ব্বে হেলা? কর্ব্বে হেলা মর্ম্ম-ব্যথা?
জন্ম আমার হিম উরসে, কুলে আমার তুল্য নাই,
সিন্ধুনদের সোদর আমি, গঙ্গাদিদির পাগ্লা ভাই!
তবুও শিকল পরিয়ে দিলে, রাখলে আমার বন্দী বেশে,
ক্ষুদ্র মানুষ, স্বল্প আয়ু, আমায় কিনা বাঁধ্লে শেষে!

*　*　*　*　*

বিকল পায়ের শিকলগুলো কতদিন সে থাক্‌বে আরো ?
রুদ্রতালে নাচ্‌বে কবে, তোমরা কেহ বল্‌তে পারো ?”

মহানন্দী ও কার্সিয়ং

ইহার পর মহানন্দী ষ্টেশন পার হইলে আবার এক নূতন শোভা চক্ষুর সম্মুখে ভাসিয়া উঠে। দেখা যায়,—সম্মুখে সুদূর-বিস্তৃত শ্যামল সমতল ক্ষেত্র ; তাহাতে তিস্তা, মহানন্দী ও বালাসন নামে তিনটি স্রোতস্বতী তাহাদের রজত-শুভ্র জল-ধারা লইয়া বহিয়া চলিয়াছে।

ইহার কিছু পরেই কার্সিয়ং ষ্টেশন। ইহাও একটি বিখ্যাত শৈল-নিবাস ও স্বাস্থ্য-কুঞ্জ।

ঘুম্ পাহাড় ও কাঞ্চনজঙ্ঘা

কার্সিয়ং-এর চারিদিকে পাহাড়ের গায়ে অগণিত চা-বাগান পাহাড়ের কর্কশ দেহখানি আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। হিমালয়ের কয়েকটী শৃঙ্গ এখানেই সর্ব্বপ্রথম দৃষ্টিগোচর হয়। ঘুম্ পাহাড়ের উপর দিয়া কাঞ্চনজঙ্ঘা, কাব্রু ও জন্নু পর্ব্বতের তুষারাবৃত শুভ্র শৃঙ্গ কয়টী দর্শকের হৃদয়ে এক গভীর বিস্ময়ের সঞ্চার করে।

আর কিছুদূর অগ্রসর হইলে ঘুম ষ্টেশন। রেল ষ্টেশনের মধ্যে ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা উচ্চস্থান। রেলপথ এখান হইতে ক্রমশঃ নামিয়া অবশেষে দার্জ্জিলিং যাইয়া পৌঁছিয়াছে।

ঘুম্‌ ষ্টেশনের পরে দার্জ্জিলিং পৌছিতে একটী 'লুপ্‌' অতিক্রম করিতে হয়। এই 'লুপ্‌' হইতে কাঞ্চনজঙ্ঘার যে অপরূপ সৌন্দর্য্য চোখে পড়ে, তাহা অনির্ব্বচনীয়।

কাঞ্চন-জঙ্ঘা

কাঞ্চনজঙ্ঘা উচ্চতায় পৃথিবীর তৃতীয় শৃঙ্গ। ইহার তুষার-ধবল শৃঙ্গের সৌন্দর্য্য বর্ণনাতীত। ইহার মনোরম দৃশ্য দার্জ্জিলিঙের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

দার্জ্জিলিঙের দৃশ্য

দার্জ্জিলিঙের প্রধান বৈশিষ্ট্য ও দেখিবার জিনিস ইহার স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য। পাহাড়ের গায়ে, আকাশের বুকে সর্ব্বত্রই অনন্ত শোভা-বৈচিত্র্য। এখানে প্রায় সর্ব্বত্রই নানা রকমের

রাশি রাশি ফুল ফুটিয়া থাকে। দেখিয়া মনে হয় যেন কোন্ এক নিপুণ শিল্পী তাহার তুলিকার সাহায্যে এখানে-ওখানে উজ্জ্বল রঙীন চিত্র আঁকিয়া দিয়াছে। আকাশের বুকে মেঘের খেলা—তাহাও অতিশয় মনোরম। কোথাও দেখা যায় যে মেঘগুলি মাথার উপর, কোথাও আবার তাহারা নীচে—বাতাসে ভর করিয়া ছুটাছুটি করিতেছে, আর তাহাদের উপর সূর্য্যকিরণ পড়িয়া নানা রকম রঙ্‌ ফুটিয়া উঠিতেছে। পর্ব্বতগাত্রে ও মেঘের বুকে এইরূপ রঙের খেলা দর্শকমাত্রকেই মুগ্ধ করে।

'ম্যল্ রোড' দার্জ্জিলিং শহরের ভ্রমণের সর্ব্বপ্রধান পথ। ইহার একপাশে বাঙলার লাটসাহেবের সুদৃশ্য প্রাসাদ। তাহার অনতিদূরে প্রকৃতির স্বাভাবিক উদ্যান—'বার্চ্চহিল্ পার্ক'।

ম্যল্ রোডের নীচে বৌদ্ধ ভুটিয়াদের 'গোম্ফা' বা মঠ। এই দেবস্থানের নিকটে ছোট-বড় নানারকম বাঁশের মাথায় রঙবেরঙের কাপড় নিশানের মত ঝুলিতে থাকে। নিশানের কাপড়ে তাহাদের ভাষায় কতকগুলি কল্যাণ-মন্ত্র লিখিত আছে। ভুটিয়াদের বিশ্বাস, নিশান যখন পত্‌পত্‌ করিয়া বাতাসে আন্দোলিত হইতে থাকে, তখন ঐ কল্যাণ-মন্ত্রগুলি তাহাদের দেবতার কাছে পৌঁছায়, দেবতা তাহাদের ভূতশান্তি করিয়া দেন।

হিমালয় অঞ্চলে বাঙ্গালীর ব্যক্তিত্ব

গোম্ফার মধ্যে বুদ্ধদেব, বিষ্ণু, অমিতাভ ও গুরু পদ্মসম্ভব প্রভৃতির মূর্ত্তি ও পট স্থাপিত আছে। প্রত্যহ তাঁহাদের পূজা হইতেছে।

পার্ব্বত্য বৌদ্ধদিগের গুরু পদ্মসম্ভবের কীর্ত্তি প্রত্যেক বাঙালীর গৌরবের বিষয়। সুদূর বাঙলাদেশ হইতে এই পদ্মসম্ভব ও দীপঙ্কর প্রচারক হিসাবে এই অঞ্চলে আসিয়া যে প্রভুত্ব স্থাপন করিয়াছিলেন। হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণীর এখানে-সেখানে আজও তাহার নিদর্শন পাওয়া যায়। ভক্তগণ আজও পদ্মসম্ভবকে বুদ্ধদেবের সহিত সমানে বসাইয়া পূজা করিয়া আসিতেছে। প্রাচীন সোনার বাঙলার ধর্ম্মগুরুগণ আজও সেখানে শ্রদ্ধার বস্তু।

ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত

দার্জ্জিলিং-এর 'যাদুঘর' এবং 'লয়েড্ বোটানিক্যাল উদ্যান' দর্শনীয় জিনিসের মধ্যে উল্লেখযোগ্য। 'বোটানিক্যাল গার্ডেনে'র অল্পদূরে 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত'। ক্ষীণকায়া 'কাগঝোরা' নামক নদী তাহার চলিবার পথে হঠাৎ এক স্থানে প্রায় একশত ফুট নীচে লাফাইয়া পড়িয়াছে,—তাহাই 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাত'।

'পাগ্‌লা ঝোরার' ন্যায় 'ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতে'র দৌরাত্ম্যও এক সময়ে কম ছিল না। তখন তাহার প্রচণ্ড রুদ্রমূর্ত্তি দেখিয়া অতি সাহসী লোকও শিহরিয়া উঠিত। কিন্তু নিকটবর্ত্তী পথঘাট ও ঘরবাড়ী মাঝে মাঝে ধ্বসিয়া পড়ায় অবশেষে অতি সুকৌশলে ইহাকেও দুর্ব্বল করা হইয়াছে।

ইহার গুরু-গম্ভীর শব্দ এখনও সকলের প্রাণে ভয় ও বিস্ময়ের উদ্রেক করে সন্দেহ নাই, কিন্তু তাহার খরবেগ ও

হিংস্র স্বভাব অনেকখানি কমিয়া গিয়াছে। জলধারা এখন আর পূর্ব্বের ন্যায় স্ফীত ও প্রশস্ত নয়। বর্ষাকালে এখন ইহার জলধারা একফুট মাত্র প্রশস্ত থাকে।

'টাইগার্ হিল্'

'টাইগার্ হিল্' দার্জ্জিলিং অঞ্চলের একটি শোভার আকর। এখানে উঠিয়া দক্ষিণ দিকে তাকাইলে দেখা যায় সেই অঞ্চলের অন্যতম মনোরম শৈলাবাস কার্সিয়ং—সোনার বাঙ্লার শস্য-শ্যামল সমতল ভূমি—আর তিস্তা, মহানদী ও মেচী নদীর রজত-শুভ্র সূক্ষ্ম জলধারা!

উত্তর-পশ্চিমে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায়,—পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ 'এভারেষ্ট্'।

এই 'এভারেষ্ট্' বিজয়ের জন্য, 'এভারেষ্ট্' শৃঙ্গে আরোহণ করিবার জন্য কত চেষ্টাই না চলিতেছে! এভারেষ্টের আকর্ষণে কত ব্যক্তি যে প্রাণপাত করিয়াছেন,—'টাইগার্ হিলে' উঠিলে সর্ব্বাগ্রে সেই কথাই হৃদয়ে উদয় হয়!

'টাইগার্ হিল্' হইতে সূর্য্যোদয়ের যে অপরূপ দৃশ্য দেখা যায় ভাষায় তাহা অবর্ণনীয়। পৃথিবীর কোনও শোভার সহিতই তাহার তুলনা হইতে পারে না। তরুণ সূর্য্য তাহার অরুণ ছটায় চারিদিক উদ্ভাসিত করিয়া ঊর্দ্ধে উঠিতে থাকে, আর শুভ্র পর্ব্বত-শৃঙ্গে তাহা বিবিধ বর্ণে প্রতিফলিত হয়। সৌন্দর্য্য-পিপাসু ব্যক্তিরা কত দূরদেশ হইতে কত কষ্ট সহ্য করিয়া 'টাইগার্ হিলে' আগমন করেন।

'টাইগার্ হিল্' সিঞ্চল পাহাড়ের প্রায় পাঁচশত ফুট ঊর্দ্ধে অবস্থিত; টাইগার্ হিলে পৌঁছিবার পথও যেন প্রকৃতি-দেবীর লীলা নিকেতন। পথের উভয় পার্শ্বে তিনি যেন স্বহস্তে মুঠা মুঠা সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া গিয়াছেন।

বিশালকায় ওক্ বৃক্ষ, চাঁপাফুল জাতীয় ম্যাগ্নোলিয়া, সুদীর্ঘ পাইন এবং 'রোডোডেণ্ড্রন' গাছ,—ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত লতাগুল্ম ও নানাজাতীয় 'ফার্ণ',—কত বিচিত্র বর্ণের ফুল,—'ক্রিপ্টো-মেরিয়া' জাতীয় ঝাউ-বন,—সুবিস্তৃত প্রান্তর,—পর্ব্বতের যত কিছু শোভাসম্পদ্, হিমালয়ের এই অংশে তাহার অনন্ত প্রাচুর্য্য।

সারা পৃথিবী ঘুরিয়া আসিলেও সোনার বাঙ্‌লার এই পার্ব্বত্য নগরী আর কাহারও তুলনায় বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ মনে হইবে না; দার্জ্জিলিং ও দার্জ্জিলিং-অঞ্চল—হিমালয়ের এই অংশটি সৌন্দর্য্যে জগতের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, একথা অক্ষরে অক্ষরে সত্য।